গ্রহণ

বিমল কর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৬৫

গ্রহণ

বাইরে গাড়ি এসে থামল। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় এসে পড়েছে।

গাড়ি যখন আসছিল শীতাংশু শব্দ শুনতে পাচ্ছিল; অনেকটা দূর থেকে শব্দ ভেসে আসতে আসতে কাছে এল, আরও কাছে এসে থেমে গেল। ততক্ষণে হাতের কাজ দ্রুত সেবে ফেলেছে শীতাংশু। গালের যেখানে যেটুকু সাবানের ফেনা ছিল সেফটি রেজারের টানে মুছে নিয়েছে। হাত বাড়িয়ে তোয়ালে নিচ্ছে, গাড়ির হর্ন বাজল।

'আমি তৈরী…,' মুখ মোছা শেষ করে হালকা গলায় জোরে জোরে বলল শীতাংশু, নিজেব কানে নিজের গলা শুনল। অপরিমিত খুশীতে তার গলার স্বর চঞ্চল। আয়নায় মুখ দেখল দু পলক, সকৌতুকে গাল ফোলাল, চিবুকের ওপর আঙুলের ডগা ঘষে মসৃণতা পরখ কবল। যাই বলো, একটু ফরসা হয়ে গিয়েছি; সামান্য মোটা —মানে কিঞ্চিৎ চর্বিও লেগেছে গায়; তুমি দেখতেই পাবে।

ব্রাশ ধুতে বসব নাকি এখন? পাগল! ওসব ব্লেডফ্লেড যেমন আছে পড়ে, থাক; স্টেশন থেকে ফিরে এসে কিংবা স্নানের সময় পরিষ্কার করা যাবে, আপাতত কাপের মধ্যে ডোবানো থাকল।

দাড়ি কামানোর পর একটু ক্রীম ঘষে নেওয়া শীতাংশুর অভ্যেস। এত সকালে মুখ মোলায়েম করতেও ইচ্ছে হল না। শুকনোই থাকুক, খসখস কববে—করুক, ফরসার ভাবটা সহজেই নজরে আসবে। ভোরবেলার মুখে একটু অযত্নই মানায়।

উৎফুল্ল, সহাস্য এবং প্রসন্ন মুখে বাথরুমের বাতি নিবিয়ে শিস দিতে দিতে শীতাংশু শোবার ঘরে চলে এল। এখন ট্রেনটা কোথায়? গঙ্গারামপুর না কি যেন নাম স্টেশনটার—সেখানে নাকি? চুলোয় যাক গঙ্গারামপুর। আমি তো তৈরী। শীতাংশু পুরোপুরি তৈরী হয়ে

বসে আছে, শুধু জামাটা গায়ে দেওয়া আর জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে নিতে যা বাকি।

শোবার ঘর মন্দ দেখাচ্ছে না। জিনিসপত্র বেশী না থাকাই ভাল। ঘরের মধ্যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা থাকলে বেশ আরাম পাওয়া যায়। শীতাংশু জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে ফাঁকা ছিমছাম ঘর আবার দেখে নিল। কাল সন্ধ্যেবেলায় অনেকটা সময় গেছে এই ঘর গোছাতে, তিন মাসে একেবারে হোটেল হয়ে উঠেছিল। এবার এন্তার চা এবং সিগারেট খাওয়া চুকল, তাসের পাট উঠল।

মাফলার নেবে কি নেবে না ভেবে আলনার কাছে খুঁতখুঁতে মনে একটু দাঁড়িয়ে থাকল শীতাংশু। শীতের শেষ চলছে, বেলায় ঠাণ্ডা থাকে না, কিন্তু এখন ভোর, সোয়া ছ'টা সবে, ন'মাইল পথ গাড়িতে বসে বাতাসের ঝাপটা খেতে হবে। মাফলার নিয়ে নিল শীতাংশু, গায়ে কোট চাপাল।

কোটের বোতাম লাগাবার সময় নজরে পড়ল, আলনার নীচে, এক পাশে, শাড়ি। হালকা নীল এবং হলুদের ছোট ছোট ফুলের ছাপ। খুব পাতলা এবং নরম জমি বলে সিল্ক বলে ভুল হতে পারে, কিন্তু সিল্ক নয়।

শাড়িটা কি থাকবে?

রমলাদিকে ওই ছেঁড়া শাড়ি ফেরত দিতে গেলে বলবেন, ঘুম হচ্ছিল না বুঝি!

ঘুম বেশ ভালই হচ্ছিল, হবেও, কিন্তু যিনি আজ আসছেন, তিনি বাড়িতে পা দিয়ে শোবার ঘরে শাড়ি দেখলে কি বলবেন বোঝা এমন কিছু কষ্টকর নয়। আরও একটু মজা অবশ্য করা যেতে পারে; শাড়িটা কার, কি ভাবে এল—এ-সব প্রশ্নের জবাবে যদি শীতাংশু অপ্রতিভের ভান করে মাথা চুলকোয়, আমতা আমতা করে কিছু বলতে যায় অথচ স্পষ্ট কিছু না বলে তবেই হয়ে যাবে, সুমিত্রার মুখের রঙ মেঘলা হয়ে আসবে।

যেন সেই কাল্পনিক ঘটনা এই মাত্র ঘটেছে, এবং শীতাংশু তার মজা উপভোগ করছে: তার মুখে চাপা হাসি, চোখে কৌতুক। ছোট্ট টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, মানিব্যাগ, চাবির রিঙ তুলে নিয়ে পকেটে রাখল শীতাংশু। রেখে আবার প্যাকেট দেশলাই বের করল; সিগারেট ধরাল। শিস দিতে দিতে ঘরের বাতি নিবিয়ে বাইরে চলে গেল।

মোহন এখনও আসে নি; তার আসতে আসতে রোদ উঠে যাবে। কাল অন্তত দশবার শীতাংশু মোহনকে বলে দিয়েছে, একটু সকাল সকাল আসতে। আসুক বেটা বেলা করে—সিঁড়িতে বসে থাকবে; উপায় কি!

দরজায় তালা দিয়ে শীতাংশু গাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। সকালের চেহারাটা বেশ ফরসা, একেবারে ধোয়া মোছা, সামান্য শীত রয়েছে। কাছাকাছি কোথাও আজ কুয়াশা চোখে পড়ছে না। বাগানে শিশির। ঘাসের ওপর পা রাখার পর মনে হল, সুমিত্রা হয়তো কাল সকালে এ-সময় তার কার্পেটের চটি পরে ঘুরে বেড়াবে সামনেটায়। নতুন জায়গায় ভোরবেলার আলাদা এক চার্ম আছে। সুমিত্রাকে বিছানায় শুইয়ে রাখা মুশকিল হবে কাল।

শীতাংশু গাড়ির সামনে এসে অবাক। রমলাদি বসে আছেন ভেতরে।

"আপনি···! আমি জানিই না আপনি রয়েছেন!"

গাড়িটা অফিসের জীপ, তবে ঢাকাঢোকা দেওয়া, পত পত করে ক্যানভাস ওড়ে না। ইস্পাতের ঘন নীল রঙের বডি, গায়ে ছোট করে অফিসের নাম লেখা। শীতাংশু ভেবেছিল ইন্দ্র আসবে গাড়ি নিয়ে, এসেছে কিশোরীলাল।

মাথা নুইয়ে গাড়িতে উঠল শীতাংশু।

রমলা বলল, "ওখানে কেন, ভেতরে এসে বসুন।"

"ঠিক আছে, এই তো বেশ···"

"গাড়ি চললে বেশ লাগবে না। ঠাণ্ডা লাগবে।"

"না—না। এখন আর কি এমন ঠাণ্ডা!" বলে শীতাংশু পাশ এবং সামনেটা দেখে নিল। পাশের কাটা-জানলায় একসময় কাচের আড়াল ছিল, এখন নেই; সামনের দিকটাও কিশোরী একটু ফাঁক করে নিয়েছে দেখার সুবিধের জন্যে।

কিশোরী গাড়িতে স্টার্ট দিল, বলল, "পিছেমে আরাম মিলেগা, সাব; উতারনেকি বাখাত সামনে বহুত হাওয়া লাগেগি।"

গাড়ি চলতে শুরু করার মুখে শীতাংশু কি ভেবে হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে কায়কষ্টে ভেতরে এসে বসল।

রমলা বলল, "আমি যখন বললাম বিশ্বাস হল না!"

"না; তা নয়", শীতাংশু হাসি-মুখ কবল, "এতটা রাস্তা আপনার দিকে পিঠ করে বসে থাকব।"

কোলের ওপর শালের চমৎকার কমলা-লাল নকশা ছড়ানো রয়েছে, শালের গায়ে হাত রেখে আস্তে করে হাঁটু মুড়ে বসল রমলা; মিষ্টি করে হাসল, "মুখ করেই বসুন। এরপর কি আব সহজে মুখ দেখাবেন!"

পরিহাসটা শীতাংশু বুঝল, অনুভব করল। গাড়ি চলছে, শেষ কোয়ার্টার গায়ে রেখে ডান দিকে মোড় নিল টাল খেয়ে। ইতিমধ্যে শীতাংশুর মুখে একটা সুন্দর জবাব এসে গেছে; রমলার দিকে তাকাল, কিন্তু বলতে পারল না। এ-সব ক্ষেত্রে এখনও সে বেশ অসুবিধে বোধ করে। যদি রমলার সঙ্গে সম্পর্কটা সেই রকম অনাড়ষ্ট হত তবে কোনো কোনো ঠাট্টা তামাশা অক্লেশে চলতে পারত।

"আপনার সেই শাড়িটা আমার ওখানে পড়ে আছে—।" শীতাংশুর মনে পড়ে গেল শাড়ির কথা।

"শাড়ি···! ও!" রমলা এক মুহূর্ত সময় নিয়ে খেয়াল করতে পারল। "ওই পুরোনো শাড়ি আমার আর কি কাজে লাগবে! মোহনকে দিয়ে দেবেন, ঝাড়া মোছা করবে।"

কাল ঘর পরিষ্কারের সময় শাড়িটা এ-বাড়িতে এসেছে। দরজা জানলা খাট, ঝাড়ামোছার জন্যে শীতাংশু মোহনকে বলেছিল, একটা ঝাড়নটাড়ন গোছের নিয়ে আয়। বেটা এক শাড়ি এনে হাজির করল; সঙ্গে এলেন শাড়ির মালিক। ঘর গোছানো হচ্ছে শুনে রমলাদি নিজের থেকে এসে সাহায্য করতে বসলেন। অজস্র ধুলো ঘেঁটেছেন উনি, অনেক জঞ্জাল সাফ করে দিয়েছেন। ঠাট্টা করেই বলেছিলেন, 'আহা, নতুন মানুষ আসছে বাড়িতে, ঘরদোর গোছাবেন, তা আগে একটা খবর দিলেই পারতেন, সব ব্যবস্থা করে দিতাম।'

সুমিত্রা আসার পর শোবার ঘরের আলনায় রাখা যে শাড়িটা নিয়ে তামাশা করার কথা সামান্য আগে মনে এসেছিল, এখন হঠাৎ শীতাংশু তা অশোভন মনে করল। ঠিক এ ধরনের ঠাট্টা তামাশা রমলাদির জিনিস নিয়ে করা চলে না।

"আপনি স্টেশনে যাবেন আমায় বলেন নি তো?" শীতাংশু বলল।

"বলেছি,...যাবার সময় বলেছি। শুনতে পান নি বোধ হয়—" রমলা ঠোঁটের গায়ে হাসি মাখিয়ে রাখল।

শীতাংশু অন্যমনস্কের ভাব করে বলল, "তেমন করে কিছু বলেন নি; যেতে পারেন বললেন, আমিও অতটা ভেবে দেখি নি।"

"বললাম না—গাড়ি আমার ওখান হয়ে আসবে!"

হয়তো উনি বলেছিলেন, শীতাংশু খেয়াল করে শোনে নি। এই গাড়িটা ওঁদের কোয়ার্টারেই বেশীর ভাগ সময় রাত্রে থাকে।

"ট্রেনটা আসছে কখন?" রমলা শুধলো।

"সাতটা দশ...।"

"এখন ক'টা হল?" রমলা নিজের ঘড়ি দেখল না।

শীতাংশু ঘড়ি দেখল। "ছটা পঁয়ত্রিশ।"

"সময় আছে।"

বাইরে তাকাল শীতাংশু, গাড়ির পেছনের দিকে। ওপরের কাচ ওঠানোর উপায় নেই এখন। মোটা অপরিষ্কার কাচের ভেতর

দিয়ে সকালের শুভ্রতা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। গাড়িটা এ-সময় পাহাড়ের পায়ের তলা বেয়ে হুহু করে নীচে নামতে শুরু করেছে, সামনে দিয়ে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের অফুরন্ত দমকা আসতে লাগল, যেন বান আসছে বাতাসের। শব্দ হচ্ছিল, বাতাস কেটে গাড়িটা যত ঢালুতে নেমে যাচ্ছে, ততই কানের কাছে সোঁ-সোঁ শব্দটা বাড়ছে। সামনে বসলে এই ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা খেতে হত মুখে।

রমলা বলল, "আপনার মাস্টারমশাই বলেছেন, এখন দু একদিন আপনারা আমাদের বাড়িতে অতিথি।"

শীতাংশু আগেই অনুমান করেছিল আজকের দিনটা দেবীদাসবাবুর বাড়িতেই তাদের অন্নের ব্যবস্থা থাকবে। হেসে বলল, "আমার আপত্তি কি, আমি তো প্রায়ই অতিথি।···কিন্তু দুদিন কেন? এ-বেলা হলেই যথেষ্ট হত।"

"ও-বেলা কি, বাতাস···?" রমলা গলা চেপে হাসছিল।

"কেন, সুমিত্রা···! মোহনও তো আছে।"

"বেচারী আসতে না আসতেই রান্নাঘরে যাবে! কেন?"

"আপনি এমনভাবে বলছেন, যেন—" শীতাংশু হেলান দিয়ে বসল, "যেন ওর রান্নায় বসা অভ্যেস নেই।"

রমলা হাসি হাসি চোখ করে শীতাংশুকে দেখছিল, এই ধরনের দৃষ্টি কেমন যেন, দেখে এক, ভাবে অন্য। রমলা বলল, "বুঝতে পেরেছি।···তা আমায় বলে কি হবে, আপনার মাস্টারমশাইকে বলবেন।" গালের মধ্যে জিবের ডগা গোল করে বুলিয়ে চাপা হাসি যেন হালকা করার চেষ্টা করল রমলা।

শীতাংশু চুপ করে থাকল। উপায় নেই। রমলার সঙ্গে সম্পর্কটা আরও সহজ করে নিতে না পারলে তাকে কথায় কথায় চুপ করে যেতেই হবে। দেবীদাসবাবুর স্ত্রীকে ঠিক কি ধরনের সম্পর্কের মধ্যে নিলে সবটা মানিয়ে যায় শীতাংশু আজ তিন মাসেও স্থির করতে পারল না। অবস্থাটা ইদানীং বেশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। উনি

মাঝে মাঝেই ঠাট্টা তামাশা করেন, এ-কথা সে-কথা বলেন, কৌতুক করেন, হৃদ্যতা দেখান, ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করেন। শীতাংশু ওঁর আচরণ ও ব্যবহার খুবই পছন্দ করে; চমৎকার লাগে ওঁকে; মনে হয়, এই বিদেশে আত্মীয়তার স্পর্শ যতটা পাওয়া সম্ভব ওঁদের কাছ থেকে শীতাংশু পেয়েছে। উনি যে খুব আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চান তাতে সন্দেহ নেই। এখন উভয়ের মধ্যে পরোক্ষে যেরকম সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তা অনেকটা বন্ধুর মতন। রমলাদি কখনও কখনও প্রকাশ্যে এমন ব্যবহার করেন যে, শীতাংশুর আরও একটু অন্তরঙ্গ হবার ইচ্ছে করে, নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে যে-ধরনের অন্তরঙ্গতা সম্ভব। কিন্তু এখন পর্যন্ত শীতাংশু তার আড়ষ্টতা পুরোপুরি ভাঙতে পারল না। দেবীদাসবাবুর ছাত্র না হলে শীতাংশু রমলার সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক সহজ করে নিতে পারত।

গুরুপত্নীব দিকে তাকাল শীতাংশু, দৃষ্টিতে সারল্য এবং কৌতুক, কিঞ্চিৎ ক্ষোভও যেন রয়েছে। মনে মনে বেশ একটা হাস্যকর কথা সে ভাবল: আপনাকে যদি বউদি বলে ডাকতে পারতুম তাহলে দেখতেন আজ এই গাড়িতে যেতে যেতে এমন সব মজার কথা বলতাম, সুমিত্রার গল্প শোনাতাম যে আপনি হেসে মরতেন।

রমলার চোখ পড়েছিল, শীতাংশুর মুখের ভাব লক্ষ করে বলল, "কী যেন ভাবছেন—"

শীতাংশু চোখ সরিয়ে নিয়েছিল, বলল, "কিছু না।"

রমলা বিশ্বাস করল না, চোখের ভুরু গুটিয়ে বলল, "কিছু-ই না?"

"না, তেমন কিছু না।...আপনাকে স্টেশনে দেখতে পেলে সুমিত্রা খুব খুশী হবে।"

"নাকি!...আমাকে জানেন উনি?"

"উনি!" শীতাংশু সহাস্য বিস্ময় প্রকাশ করল, "উনিটা আবার কে! সুমিত্রাকে অতটা সম্মান দেবার কিছু নেই। তুমিটুমি বলবেন গোড়া থেকেই।"

রমলা এবার গলা তুলে হেসে উঠল। গ্রীবার কাছে নীল শিরা ফুটে উঠেছিল। শীতাংশু এবারও লক্ষ করে দেখল, রমলার গলা বেশ লম্বা, সচরাচর বাঙালী মেয়েদের যা দেখা যায় না। বরাবরই শীতাংশুর মনে হয়েছে, ওঁর সুন্দর, সুডৌল, ঈষৎ দীর্ঘ গ্রীবার জন্যে ওঁর ঘাড় এবং মুখের সৌন্দর্য আরও সুস্ফুট হয়েছে।

"আপনার অত ভয় কি—" হাসি ফুরোলে রমলা বলল, "আপনার সম্মান কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।"

শীতাংশু একটু পাশ করে বসল, রমলার পায়ের দিকের শাড়ি বাইরের দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে ফুলে উঠছে, হয়তো তার ট্রাউজারের সঙ্গে ছুঁয়ে যাবে। না, কিছু না তেমন, তবু ভাল দেখায় না। সামান্য সরে বেঁকা হয়ে বসে শীতাংশু বলল, "আমাকেই বা আপনি কেন সম্মান দেখান বুঝি না।"

"মানে, দেখাব না ?"

"কি দরকার !"

"মাস্টারমশাইয়ের বউ মাস্টারনী হয়ে থাকব !" পায়ের শাড়ি সামলাতে সামলাতে রমলা আবার হেসে উঠল।

শীতাংশু অপ্রতিভ বোধ করল, "না না, তা কেন !···আপনি সম্মান না দেখালেও আমি কিছু মনে করব না।"

গায়ের শাল গুছিয়ে নিয়ে বাতাস থেকে সামান্য সরে গেল রমলা। "আপনি মনে না করলেও আমি কি অনুচিত একটা কিছু করতে পারি !" বলে বাইরে তাকাল।

কিশোরীলাল হর্নে হাত দিয়ে রেখেছে, এখন সকাল বেশ পরিষ্কার, রাস্তার পাশ দিয়ে আদিবাসী মেয়েদের কাউকে কাউকে জল আনতে যেতে দেখা যাচ্ছিল; ঘোলাটে কাচের মধ্যে দিয়ে ওদের বেশ ঝাপসা দেখাচ্ছে। কাছাকাছি কোনো গ্রাম আছে। ধোঁয়া উঠছিল কোথাও। দু চারটে মোষ গরু এদিক ওদিক চোখে পড়ল।

"আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে এখনই স্টেশন যেতে পারছি না," রমলা বলল।

শীতাংশু বুঝতে পারল না ; তাকিয়ে থাকল।

"আমায় বাজারের কাছে নামতে হবে একবার।···কিশোরী— ?"

"জী ?"

"সুরাজকা দোকান খুল গিয়া হ্যয় না ?"

"জী। কাম হ্যয় কুছ ?"

"সওদা লেনা হ্যয়···" বলে শীতাংশুর দিকে তাকাল রমলা, "এক ঢিলে দু পাখি মারছি। আপনারা ফেরার সময় আমায় তুলে নেবেন।"

"ফেরার সময় বাজারে নামলেই হত !"

"নেমে— ?"

"আপনি কাজ সারতেন।"

"আমার কাজ তো বাজার !···ট্রেনে উড়েপুড়ে যে মানুষটা আসছে তাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে আমি বাজার করব ! কী যে বুদ্ধি আপনার !" বলে রমলা একটু সময় চুপ করে থাকল, তারপর কৌতুক করে বলল, "অচেনা মানুষের একটু দেরী করে দেখা দেওয়া ভাল।"

শীতাংশু লক্ষ করল মনোযোগ দিয়ে। উনি যা বলতে চান বোঝা গেল, অথচ কোথায় যেন একটা দুর্বোধ্যতাও থাকল। তবে, শীতাংশু খুশী হল এই ভেবে যে, সুমিত্রার সঙ্গে তার প্রাথমিক সম্ভাষণগুলো অনেকটা খোলামেলা হতে পারবে, রমলাদি সঙ্গে থাকলে যা হত না।

"আপনি কিন্তু সুমিত্রার অচেনা নয়," শীতাংশু বলল।

"কি রকম ?"

"আমি আপনাদের কথা লিখেছি···।"

রমলা সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা বলল না। শীতাংশু কি লিখতে পারে অনুমান করার চেষ্টা করছে যেন এ-রকম চোখে তাকিয়ে থাকল। কিছুটা অন্যমনস্ক। সামান্য পরে সহসা এই ক্ষণিক অন্যমনস্কতা ও

গাম্ভীর্য কাটিয়ে রমলা চোখ তুলে হাসল, "আমাদের নিন্দে করেন নি তো ?"

"নিন্দে !···কি যে বলেন আপনি—!" বলতে বলতে শীতাংশু থেমে গেল, কেননা সে দেখল, উনি আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন ; চোখ ফিরিয়ে পিছনের কাচের দিকে তাকিয়ে আছেন। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে শীতাংশু কোনোরকমে তার কথা শেষ করল, "নিন্দে করার মতন মানুষ কি আপনারা ?"

রমলা হয়তো কথাটা শুনল, কোনো জবাব দিল না।

বাইরে রোদ উঠে গেছে। কিশোরীলাল এখন ঘন ঘন হর্ন দিচ্ছে। একটা কুলিব্যারাকের পাশ দিয়ে গাড়িটা ডাইনে মোড় ঘুরে স্টেশনের রাস্তা ধরল।

শীতাংশু পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেট হাতড়াচ্ছিল। রমলাদির একেবারে মুখোমুখি বসে এইটুকু জায়গার মধ্যে সিগারেট খাওয়া উচিত হবে কি না সে বুঝতে পারল না। হয়তো ওঁর নাকে মুখে ধোঁয়া লাগবে। ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার পথ থাকলে সিগারেট খাওয়া চলত। পেছনের দিকে কাচের জানলার ওপরের অংশটা তুলে দেবে, কিংবা নীচের লোহার অংশটা খুলে পাটাতনের মতন বিছিয়ে দেবে সে উপায়ও নেই, বাইরে থেকে 'লক্' করা।

বাইরের বাতাস কমে আসছে, কিশোরীলাল এখন আর বেসামাল গাড়ি চালাতে ভরসা পাচ্ছে না। লোকালয় দিয়ে তারা যাচ্ছে। মানুষ জন, বয়েল গাড়ি, মুরগী, কুকুর এমন কি পথে দাঁড়ানো দু চারটে ট্রাকও রাস্তা আটকে রেখেছে। রোদ ছড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

রমলা আর কথা বলছে না। শীতাংশু একটু অস্বস্তি বোধ করছিল ; কথা বলতে বলতে হঠাৎ একেবারে চুপচাপ হয়ে যাওয়া যেন কেমন বেমানান। বারকয়েক রমলাকে সে দেখল। মনে হল, উনি এখনও অন্যমনস্ক, কিছু ভাবছেন।

উনি কি সত্যি সত্যি ভাবছেন, আমি সুমিত্রার কাছে ওঁদের সম্পর্কে

কোনো নিন্দের কথা লিখেছি? শীতাংশু চোখ তুলে রমলাকে দেখল। গাড়ির মধ্যে আলোর ভাব এখন আরও কিছুটা বেশী হওয়ায় শীতাংশু যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে রমলার মুখ নজর করতে পারল। ওঁর মুখের কোথাও শক্ত ভাব নেই, বেশ নরম। তবু কেমন একটু বিমর্ষ লাগল।

সুমিত্রাকে বাস্তবিকই আমি তেমন কিছু লিখি নি। নিন্দের কথা তো কিছুই না। বরং আমি সুমিত্রাকে জানিয়েছি, এখানে এসে দেখলাম আমার এক পুরোনো মাস্টারমশাই আমার কর্তা, মানে তাঁর সঙ্গেই আমার কাজ, তাঁরই অধীনে। বেঁচে গেলাম। এ-রকম কপাল হয় না। মাস্টারমশাই থাকার জন্যেই যে আমার চাকরিটা হয়ে গেছে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। অতি চমৎকার মানুষ। মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে আমার খুব খাতির। ওঁর স্ত্রী—আমায় খুবই স্নেহ করেন। প্রায়ই ও-বাড়িতে যাওয়া-আসা করি, খাওয়া-দাওয়া, গল্পগুজব চলে। আজকালকার দিনে গুরুপত্নীকে তো কেউ আর মা বলে না, তা ছাড়া—উনি বয়সে মাস্টারমশাইয়ের চেয়ে অনেক ছোট, এমন কি আমার চেয়েও। বউদি বলে ডাকলে মন্দ হত না, কিন্তু দু একবার চেষ্টা করে দেখেছি, ভীষণ বেখাপ্পা লাগে। কাজেই আড়ালে বলি 'রমলাদি'; সামনে কিছুই বলি না। মাঝে মাঝে যা মজা হয়! তুমি এখানে এসে এমন একজন মনের মতন সঙ্গী পাবে যে একেবারেই ফাঁকা লাগবে না এখানটা। রমলাদি প্রায় তোমার দিদির মতন, বন্ধুর মতন হয়ে যাবেন। বয়সে উনি তোমার চেয়ে একটু বড়, কিন্তু সে-কথা তোমায় মনে করতে দেবেন না। স্বভাবটাই ও-রকম।

সম্ভবত গাড়ির সামনে কিছু এসে পড়েছিল, কিশোরীলাল ঝপ্ করে ব্রেক কষে ফেলায় শীতাংশু ঝাঁকানি খেল, এবং রমলার শরীর সামান্য লাফিয়ে উঠে শীতাংশুর দিকে টলে আবার ঠিক হয়ে গেল। কিশোরীলাল ডান দিক করে গাড়ি কাটিয়ে নিয়ে ততক্ষণে আবার

চলতে শুরু করেছে। রমলা ঝাঁকুনিটা সামলে নিলেও কোল থেকে চামড়ার ব্যাগটা শীতাংশুর পায়ের কাছে পড়ে গিয়েছিল। শীতাংশু ব্যাগ কুড়িয়ে ধুলো ঝেড়ে রমলাকে দিল।

রোদ এসে গিয়েছিল পিছনের কাচ দিয়ে। গাড়িটা ঘুরে যাওয়ায় পুব থেকে আলো এবং রোদ এসে রমলার কোলে পড়ল। ক্রমে বুক পর্যন্ত উঠল, গাড়ির কাঁপুনির সঙ্গে রোদ কাঁপতে লাগল। শীতাংশুর হঠাৎ ইচ্ছে হল, বলে: আপনার একটা প্রশংসা আমার করা হয় নি। সুমিত্রা যে-মুহূর্তে আপনাকে দেখবে, বুঝতে পারবে আপনি খুব সুন্দর, যাকে লোকে অপ্সরী বলে ঠিক সে-রকম ডানা-কাটা পরী কি না জানি না—কিন্তু আপনার গড়ন, মুখের ছাঁদ, চোখ নাক গলা হাত—প্রত্যেকটি অঙ্গই এমন সুন্দর যে চোখ চেয়ে দেখতে হয়।

শীতাংশু দেখল, রোদ যেন রমলার কোল থেকে লাফিয়ে একেবারে পায়ের নীচে নেমে গেল, গাড়ির মেঝেতে। লুটিয়ে পড়া শাড়ির পাড়ে চিকনের বাদামী ফুলগুলি রোদে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল।

"বাজার এসে গেল—," রমলা বলল, বলে শাল গুছিয়ে পায়ের দিকের শাড়ি সামলে নামার জন্যে তৈরী হল।

শীতাংশু আবার বলল, "আপনি স্টেশনে এলে পারতেন।"

"একেবারে স্টেশন পর্যন্ত না গেলেও কাছাকাছি তো এলাম," বলে রমলা আবার তার স্বাভাবিক সকৌতুক মুখে হাসল।

"বাজার পরে করলেও চলত, আমিই করতে পারতাম।" শীতাংশু বলল।

"ছি ছি—!"

"ছি ছি, কেন?"

"সুমিত্রা কি মনে করত? ভাবত, আপনাকে যত রাজ্যের খাটুনি খাটিয়ে নিচ্ছি।" বলতে বলতে রমলা হঠাৎ থেমে কি যেন মনে পড়ায় শীতাংশুর চোখে চোখ রেখে বলল, "দেখলেন তো, আপনার কথাই থাকল, আমি সুমিত্রাকে তুমিই বললাম। বললাম না—?"

শীতাংশু হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, "সুমিত্রা আপনার চেয়ে ছোট!"

"আমার কথা বাদ দিন, আমি তো বুড়ি হয়ে গিয়েছি।"

"কেউ বলবে না—," শীতাংশু হঠাৎ অনেক জোরে, অনেক দৃঢ় গলায়, কেমন যেন কোনো লুকোনো আবেগবশে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল।

রমলা স্থির চোখে তাকিয়ে ছিল। চোখে চোখ পড়তেই শীতাংশু হঠাৎ কেমন লজ্জা পেল, বিব্রত বোধ করল।

সুরযপ্রসাদের দোকানের কাছে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল।

২

"ইস্…, কি জায়গায় থাক !"

"কেন, এ-রকম মার্ভেলাস জায়গা… !"

"থাক, থাক। ওই দেখো, তোমার কুলি কি ভাবে আমার স্যুটকেশটা ঝুলিয়েছে হাতে, ওটা কিন্তু ভীষণ ভারী, হ্যাণ্ডেল ছিঁড়ে যাবে, তুমি ওকে মাথায় করে নিতে বল।" সুমিত্রা নিজেই হাত বাড়িয়ে কুলিব কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল।

শীতাংশু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কুলিদের তদারক করতে লাগল। তিনটে কুলি, মালপত্র ছোট বড় নিয়ে যেন তিবিশ। হুটো মস্ত স্যুটকেশ, হোল্ডঅলটা পাহাড়প্রমাণ, একজোড়া চামড়ার গদি দেওয়া বেতের মোড়া, গ্রামোফোন রেকর্ডের বাক্স, হু পাঁচটে ছোট বড় পুঁটলি, বেতের টুকরি, মেয়ে ছাতা, এমন কি রাজ্যি মাসিক-পত্রিকা।

কুলিরাও হিমসিম খাচ্ছিল, কোনটা কি ভাবে নেবে বুঝে উঠতে পারছিল না। যে জিনিসটাই তারা ধরছিল, সুমিত্রা হাহা করে উঠছিল: ঠিক সে লেও। এই, বলো না তোমার কুলিদের, ওর মধ্যে কাচের জিনিস আছে, সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে! একেবারে উজবুক ওই ধেড়ে কুলিটা! আহা—ওকে বারণ করো না—এখ্‌খুনি ধপাস করে ফেলে দেবে পুঁটলিটা—। ইস্, ওর মধ্যে আমার যত খুচরো জিনিস।…তুমিও একেবারে অকর্মার ধাড়ি, কিচ্ছু দেখছ না। …ধরো তো, আমার গরম কোটটা ধরো…। এই কুলি…

অনেকটা সময় গেল মালপত্র সামলে তিন কুলিকে নিয়ে এগুতে। শীতাংশুর হু হাতেই কিছু-না-কিছু মালপত্র; সুমিত্রার বুকের কাছে রেল স্টল থেকে কেনা একগাদা কাগজপত্র, কাঁধে ব্যাগ ঝুলছে

চামড়ার, বাঁ হাতে ফ্লাস্ক। শাড়ির আঁচল পিঠ থেকে বার বার খসে পড়ছিল বলে প্রান্তটা কোমরে জড়িয়ে নিয়েছে।

প্লাটফর্ম দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শীতাংশু বলল, "তুমি এত জিনিসপত্র নিয়ে আসবে আমি ভাবতেই পারি নি।"

"কি ভেবেছিলে তবে, একটা স্যুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে চলে আসব।"

"তা নয়; তা বলে এরকম গন্ধমাদন নিয়ে হাজির করবে—"

"আমি হাওয়া খেতে আসছি, না টুর করতে?···সংসার পাততে এলে সব জিনিসই লাগে, মশাই। সবই আনতে হয়।"

"গাড়িতে চেকার ধরে নি?"

"বিশুমামা তবে সঙ্গে ছিলেন কেন?"

"বিশুমামা আজ এখানে নেমে, কাল কোন ট্রেন ধরে পাটনা গেলে পারতেন।"

"কাজ না থাকলে নামতেন। পরে একবার আসবেন বলেছেন।"

কিশোরীলাল প্লাটফর্মের প্রায় শেষ প্রান্তে টিকিট কালেক্টারের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল; অবস্থা দেখে সে এগিয়ে আসছিল হনহন করে। এখন প্লাটফর্মে যাত্রীর ভিড় প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে।

শীতাংশু বলল, "এবারে টিকিট কালেক্টার ধরবে। তুমি বাপু সামনে থেক, আমি পেছনে।"

"ধরুক না, আমার বুঝি ঘটে বুদ্ধি নেই!"

"হাতে দুটো টাকা গুঁজে দেবে?"

"আগে কি দিচ্ছি নাকি। বলব, স্বামীর ঘর করতে আসছি নতুন—দেখছ না! জিনিসপত্র না আনলে কি চলে!···আমি বাংলায় বলব, তুমি হিন্দী করে ওকে বুঝিয়ে দিয়ো।"

শীতাংশু হোহো করে হেসে উঠল। সুমিত্রাও হাসল খিলখিল করে। একটা পান-ফেরিঅলা সামান্য তফাতে তফাতে যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে পড়ে এই বাঙ্গালী মরদ ও জানানার উচ্চস্বর হাসি শুনল, সুমিত্রাকে দেখল। জানানার হাঁটা দেখে তার মনে হল, বহুৎ তেজী।

পাথরকুচি আর মোরমে ভরা প্লাটফর্ম। আর সামান্য এগিয়ে স্টেশনের অফিসঘর, বাঁ দিক ঘেঁষে নীচু ছাদের টানা এক বিল্ডিং, তার গা ঘেঁষে নতুন ক'টা ঘর উঠেছে, অ্যাসবেসটয়ের ছাদ। অফিসঘরের শেষে প্লাটফর্মের ওপর একটা টি-স্টল।

উজ্জ্বল রোদে ভেসে যাচ্ছিল খোলা প্লাটফর্ম, বিশ পঁচিশ গজ অন্তর কৃষ্ণচূড়া গাছ, কোথাও বা করবী ঝোপ। এ সময়, শীতের শেষ বলে, সকালের রোদে নীল ফড়িং উড়ছিল।

কিশোরীলাল সামনে এসে পড়েছিল। সুমিত্রাকে একটু দেখে নিল, যেন দাশসাহেবের বউ দেখার সরল স্বাভাবিক আগ্রহ তার ছিল। শীতাংশুর দিকে হাত বাড়িয়ে কিশোরীলাল মালপত্রগুলো চাইল, "হামকো দে দিজিয়ে, সাব।"

"আমাদের ড্রাইভার কিশোরী," শীতাংশু বলল সুমিত্রাকে, "ওর হাতে কিছু দিয়ে দাও।"

শীতাংশু বাঁ হাতের টুকরিটা কিশোরীকে দিয়ে দিল, সুমিত্রাও কাগজপত্রগুলো তুলে দিল।

"কিশোরী, এত মালপত্র তোমার গাড়িতে যাবে?" শীতাংশু জিজ্ঞেস করল। করেই সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, "তোমাকে আবার একবার আসতে হবে বোধ হয়।···দেখ, কি অবস্থা দাঁড়ায়···! না হলে আমি অর্ধেক মালপত্র নিয়ে থেকে যাব, তুমি আগে এঁদের পৌঁছে দিয়ে এস। বাজার থেকে মেমসাহেবকে তুলে নিও।"

সুমিত্রা বুঝতে পারল না শেষের কথাগুলো, স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। কিশোরীলাল বড় বড় পায়ে এগিয়ে গেল সামনে।

"বাজারে আবার কোন মেমসাহেব বসে আছে গো?" সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল।

"রমলাদি।···উনি তোমায় রিসিভ করতে এসে এই ফাঁকে কিছু মার্কেটিং সেরে নিচ্ছেন।" শীতাংশু হাসল।

"তোমার মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী··· ! তা তিনি তো মেমসাহেব নন, তবে— ?"

"কিশোরীর কথা বলছ ! এসব জায়গার এই রকম হাল। দেখলে না, আমাকেও সাব বলল। তোমার দুঃখু পাবার কিছু নেই, তোমাকেও মেমসাহেব বলবে।" শীতাংশু হাসছিল।

সুমিত্রা ভ্রূ-ভঙ্গি করল। "থাক, আমার আর মেমসাহেব হয়ে কাজ নেই। যে রকম একটা কালোমালো চেহারা, খেঁদাবোঁচা···! এই, এবার কিন্তু রেডী হও, টিকিটের লোকটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে।"

শীতাংশু পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখল। দু পাঁচটা টাকা যাবে আর কি ! মাল নিয়ে কুলিরা চলে গেছে, কিশোরীলালও বেরিয়ে গেল।

সুমিত্রা কাঁধের ব্যাগ বুকের কাছে টেনে হাঁটতে হাঁটতেই টিকিট বের করে নিল। "চন্দন তোমায় একটা চিঠি দিয়েছে। নেবে নাকি এখন ? থাক, বাড়ি গিয়েই নিয়ো।"

"চন্দন কি এসেছিল নাকি ?"

"পরশু সবাই এসেছিল। সারাটা রাত হুড়োহুড়ি।"

টিকিট কালেক্টারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল দুজনে। শীতাংশু কি বলবে কি করবে ভেবে ঠিক করার আগেই সুমিত্রা হাতের টিকিটটা বাড়িয়ে দিল। দিয়ে গায়ে পড়েই বেশী মালপত্র হবার কারণটা বোঝাতে গেল। বলছিল বাংলা করে, হঠাৎ বুঝি খেয়াল হল নাদুসনুদুস টিকিটবাবুটি কিছুই বুঝি বুঝতে পারছে না। হিন্দী করে বলতে গিয়ে কি যে বলল সুমিত্রা কে জানে, টিকিটবাবু হেসে ফেলল।

"হাম বাংলা বুঝি।···ঠিক হ্যয়, যাইয়ে···" টিকিটবাবু হাসিমুখেই বলল।

সুমিত্রা খুব খুশী। শীতাংশুর দিকে এমন চোখ করে তাকাল, যেন বলতে চাইল, দেখলে তো—আমিই কার্যোদ্ধার করলাম।

শীতাংশু টিকিটবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হাসার মুখ করল, "থ্যাংকস··· ।"

একরাশ টিকিট হাতের মুঠোয়, প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে টিকিটবাবু শীতাংশুর দিকে এমন করে তাকাল যেন শীতাংশুকে সে চেনে। "এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সেন্টার—?"

মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানাল শীতাংশু।

"স্টেশনে বাজারে হারবাখাত আপলোককে দেখি।"

"প্রায়ই আসতে হয়," শীতাংশু সৌজন্য প্রকাশ করে হাসল।

"এক দফে ফিন যাব উধার। কুছ কাম ভি আছে···"

"আসবেন, নিশ্চয় আসবেন।···আচ্ছা, যাই আজ···। কই, চলো—" সুমিত্রাকে ডাকল শীতাংশু।

ফটক পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে আসতেই খানিকটা ঢালু। ইঁটের চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ি নামতে নামতে সুমিত্রা বলল, "লোকটা খুব ভাল, যাই বল।"

"তোমায় দেখে আরও ভাল হয়ে গেল।"

"আহা, আমি এমন কিছু দেখাই নি।" সুমিত্রা টপ টপ করে সিঁড়ি নামতে লাগল। নামতে নামতে কি ভেবে ছেলেমানুষের মতন হেসে আবার বলল, "আমার হিন্দী আর ওর বাংলার বহর কিন্তু সমান।"

সামান্য দূরে জিপগাড়িটা দাঁড়িয়ে। কিশোরীলাল পিছনের কাটা-দরজা খুলে মালপত্র ঢোকাচ্ছে। ওপাশে একটা তেলের গাড়ি দাঁড় করানো। কার যেন একটা মটর-বাইক রাখা রয়েছে সযত্নে। অল্প তফাতে দু চারটে দোকান, পান-বিড়ি মেঠাই মণ্ডা বেচে। মস্ত একটা বটগাছ পশ্চিমদিকে, তার তলায় বাচ্চাদের খেলার রথের মতন একটু বড় মাপের এক মন্দির, তার গা ঘেঁষে একটা বাঁশ পোঁতা রয়েছে, বাঁশের ডগায় খানিকটা লাল সালু উড়ছে পতপত করে।

সুমিত্রা বলল, "জায়গাটা মন্দ লাগছে না—। মনে হচ্ছে. কোন্ এক রাজ্যে চলে এসেছি।"

"বেহার রাজ্যে এসেছ," শীতাংশু মজা করে বলল। "আমায় কমন লাগছে বললে না তো ?"

ঘাড় ফিরিয়ে স্বামীকে দেখল সুমিত্রা। ঠোঁটের কোণ ঘেঁষে াসি তুলল, "মন্দ কি ! বেশ বেহারী বেহারী চেহারা হয়েছে। চুল কটেছ কোত্থেকে ?"

"ওই একটা অসুবিধে এখানে খুব— ।" শীতাংশু বাঁ হাত ঘাড়ের ।পর বুলিয়ে চুলের ছাঁট পরখ করে নিল। "আমি একটু মোটা হয়ে গয়েছি না ?"

"এক রত্তি··· ।"

"বল কি ! আমার মনে হচ্ছে আট-দশ পাউণ্ড ওয়েট্ বেড়ে গছে।"

"তোমায় একটু চকচকে দেখাচ্ছে," সুমিত্রা বলল ; বাঁ হাতে নজের ধুলো ময়লায় ভরা রুক্ষ অগোছালো ভাঙা খোঁপায় হাত দিয়ে কছু একটা করে নিল। "তোমাদের এখানের জলে চুল ওঠে নাকি ? আমার মুঠো মুঠো উঠে যাচ্ছে।"

প্রশ্নটা ভীষণ বেয়াড়া ধরনের। শীতাংশু এখানের জলের কোনো দাষ দেখতে পেল না। হজম হয় কি না, খিদে পায় কি না, জলের াদ কেমন—এসব প্রশ্নের জবাব তার জানা আছে, কিন্তু চুল ওঠে কি া কি করে বলবে ! তার অন্তত ওঠে না। বলল, "চুল উঠবে কেন ? ়ই না।" বলার পর তার রমলার কথা মনে পড়ল। ওঁর মাথা ভরা ন্দর চুল।

ততক্ষণে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। মনে হল, কশোরী কিছুই রেখে যাবে না, গাড়িটা মালপত্রে ঠেসে ফেলেছে। পছনের কাটা-দরজার নীচেটা ঝুলছে, তার ওপর ছোটখাটো ুঁটলিগুলো বসানো। শীতাংশু রীতিমত ভয় পেল, গাড়ি চলতে শুরু করলে ওগুলো যথাস্থানে থাকবে বলে তার মনে হল না।

"কিশোরীলাল, আমরা বসব কোথায় ?"

"থোড়া তকলিফ হোগা, সাব। মাগর হো যায়গা!"

কি করে হবে বুঝল না শীতাংশু। একে এই অবস্থা, এর ওপর রমলাদি আছেন, তাঁর বাজারপত্র কি আছে তাই বা কে বলবে!

"সত্যি, তুমি যা লটবহর করলে—কোনো রকমে বাড়ি পৌঁছতে পারলে হয়।" শীতাংশু কুলিদের পয়সা দিতে দিতে সুমিত্রাকে বলল।

"আমায় না হয় ফেলে যেও রাস্তায়, কিন্তু দোহাই তোমার, জিনিসপত্র ফেল না। শুনছ, তুমি ওই পুঁটলিগুলোকে একটু ধরে-টরে রেখো।" সুমিত্রা অনুনয় করে বলল।

শীতাংশু যতটা দুশ্চিন্তা করছিল ততটা দুশ্চিন্তার বাস্তবিক কিছু ছিল না, কিশোরীলাল লটবহর উঠিয়ে কোনো রকমে বসার একটু জায়গাও রেখেছিল। সামনের সিটে দিব্যি একজন বসতে পারে, পায়ের কাছে অবশ্য বড় একটা টুকরি রয়েছে। শীতাংশু সুমিত্রা সামনে দিয়ে উঠে পেছনের দিকে চলে গেল, সুমিত্রা বসল সীটে, শীতাংশু সুটকেসে, হাত বাড়িয়ে পুঁটলিগুলো সামলাতে লাগল। সামনের সীটটা রেখে দেওয়া হল রমলার জন্যে।

গাড়ি চলতে শুরু করলে শীতাংশু সিগারেট ধরাল। বলল, "রমলাদি বেচারী হাঁ করে বসে আছেন; ভাবছেন, হল কি?···তোমার গাড়ি প্রায় কুড়ি মিনিট লেট করেছে—বুঝলে!"

"তোমাদের বাজারটা কোথায়?" সুমিত্রা শুধলো।

"সামান্য এগিয়ে।"

"কেমন বাজার?"

"ছোটখাটো। চাল ডাল তেল সাবান এ-সব পাবে আর কি!"

হোল্ডঅলটা এমন করে রেখেছে কিশোরীলাল যে সামনের দিকের আধখানা আড়াল পড়ে গেছে, কিন্তু জায়গা কুলিয়েছে। কিশোরীলালকে দেখা যাচ্ছিল না পিছন থেকে।

সুমিত্রা এবার হাই তুলল। "বাড়ি গিয়েই আমি চান করতে

ঢুকব, কি ময়লা যে সারা গায়!···তোমার সেই চাকরটা আছে না পালিয়েছে?"

"আছে। আমি যখন আসি তখনও আসে নি।"

"আসবে তো?"

"আসবে। এখানে চাকর পালায় না।···তা তোমার তো আজ সারাদিন ছুটি, রান্নাবান্না নেই···"

"কেন, ছাতু খাবে নাকি?" সুমিত্রা হাসল।

"মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া, এবেলা ওবেলা; এখন দিন দুই ওঁর বাড়িতেই খেতে হবে।"

সুমিত্রা শুনল। হঠাৎ তার কি যেন খেয়াল পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে কিশোরীলালকে দেখবার চেষ্টা করল, তারপর শীতাংশুর দিকে অনেকটা ঝুঁকে, গাড়ির শব্দের তলায় গলা নামিয়ে বলল, "হ্যাঁ গো, তোমার মাস্টারমশাইয়ের তো বয়েস হয়েছে, না! তাই না লিখেছিলে?"

"হ্যাঁ, বছর পঞ্চাশ হবে।"

"তাঁর স্ত্রী তোমার বয়েসী হল কেন?" সুমিত্রার গলায় পরিপূর্ণ কৌতূহল।

"আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোটই হবে—বছর বত্রিশ।"

"এত ছোট-বড়?" সুমিত্রার গলার স্বরে কোথায় যেন একটা সন্দেহ। "এই কি প্রথম, না দ্বিতীয় পক্ষ?"

শীতাংশু নিজেও ঠিক জানে না। কৌতূহল তারও কম নয়, কিন্তু ব্যাপারটা এমন যে কাউকে সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না। অন্তত শীতাংশুর কেমন সঙ্কোচ হয়। অফিসের লোকরাও স্পষ্ট কিছু জানে না, তাদেরও ধারণা—রমলাদি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

সুমিত্রা একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল জবাবের আশায়। কি বলবে বুঝতে পারল না শীতাংশু। মৃদু গলায় বলল, "ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না, তবে তুমি যা ভাবছ—ওই রকমই ভাবে অনেকে।" বলতে

বলতে শীতাংশু অন্যমনস্কভাবে কথাটা ভাবতে লাগল। রমলাদি কি সত্যিই দ্বিতীয় পক্ষ? আচমকা শীতাংশুর মনে হল, রমলাদি তখন যে নিন্দের কথা বলছিলেন তা কি তবে এই? উনি কি সন্দেহ করেছেন, শীতাংশু এই কৌতূহলের বিষয়টা সুমিত্রাকেও জানিয়ে রেখেছে।

সুমিত্রা শুধলো, "কেমন দেখতে তোমার মাস্টারমশায়ের বউ? সুন্দরী?"

শীতাংশু আস্তে করে মাথা নুইয়ে নাড়ল। "আমার চোখে সুন্দরীই মনে হয়।"

স্বামীর চোখের মধ্যে চোখ রেখে সুমিত্রা কি যেন দেখল, তারপর হেসে ফেলল, "তোমার চোখে আর কিছু মনে হয় না তো?"

"যাঃ!···শুনছ না, গুরুপত্নী?"

"ইস, ভয়ঙ্কর গুরুভক্তি যে!"

"তা ঠিক। আমাদের আবার একটু ওই বাতিক-টাতিক আছে, পুরোনো আমলের ছেলেছোকরা তো···"

"রাখো!" সুমিত্রা মজা করে ধমক দিল স্বামীকে, "তোমাদের আবার ভক্তি! সেই ইন্দ্রর গল্পটা···"

"এই—" শীতাংশু বাধা দিল, সুমিত্রার গলা সামান্য চড়েছে, ইন্দ্রর কানে যেতে পারে। সতর্ক হয়ে শীতাংশু বলল, "তুমি একেবারে লাউড হয়ে গেছ!"

"একেবারে···" সুমিত্রা হাসল, তারপর বলল, "তা বাচ্চাকাচ্চা আছে?"

"না।"

সুমিত্রা আবার হাই তুলল। কেন যেন, এইবার তার ক্লান্তি লাগছে। চোখ জ্বালা করছে বেশ। চোখের পাতা ঘষে নিল সুমিত্রা আঙুলে। অলস গলায় বলল, "তোমার কলেজের প্রফেসার ছিলেন নাকি উনি?"

"না, ঠিক রেগুলার প্রফেসার নন; মানে আমাদের ফার্স্ট ইয়ারের সময় দেবীদাসবাবু কিছুদিনের জন্মে কলেজে এসেছিলেন—বটানির ল্যাবরেটরীতে কিসের একটা কাজ করছিলেন···। মাঝে মাঝে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে এসে একটু দেখতেন। বেশ নাম-করা ছাত্র ছিলেন সে সময়ে। আমাদের খুবই স্নেহ করতেন···"

"কি নাম?"

"দেবীদাস গুহ। ডক্টরেট পেয়েছিলেন তখনই—কি এক-আধ বছর আগে হবে।"

সুমিত্রার ভুরুর ওপর টিপটিপ করছিল, চোখ এখন বেশ টেনে আসছে, রাত্রে ট্রেনে চোখ বুজে বুজেই কেটেছে, ঘুম আসে নি—গাড়ির ঝাঁকুনি, চাকার শব্দ, কখন ভোর হবে—ভোর হবে করে এত উদ্‌গ্রীব যে মাথার ভেতরটা অস্থির হয়ে ছিল। এখন নিজের জায়গাটিতে পৌঁছে গিয়ে, সকালের বাতাসে যেন হঠাৎ সেই ঘুম চোখের কোলে নেমে আসছিল। ঈষৎ জড়ানো চোখে, ফাঁকা ফাঁকা মাথায় নামটা শুনল সুমিত্রা। শুনে আবার হাই তুলল, চোখের পাতায় আঙুল ঘষে ঘুম কাটিয়ে নিচ্ছে, হঠাৎ তার মনে হল, সে যেন কি একটা নাম বলতে শুনল শীতাংশুকে—কি নাম?

সুমিত্রা আবার নাম জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, গলা পর্যন্ত এসে গিয়েছিল কথাটা: কি নাম বললে···? কিন্তু ততক্ষণে তার নামটা স্পষ্ট মনে পড়ে গিয়েছে; দেবীদাস গুহ।

চোখের পাতা পড়ল না আর, নিশ্বাস বন্ধ হল, ঠোঁট ফাঁক হয়ে থাকল, হঠাৎ কেমন এক অ-চেতনার ভাব এসে গেছে ওর। স্থির অসাড় দৃষ্টিতে সুমিত্রা তাকিয়ে থাকল।

শীতাংশু কিছু খেয়াল করল না সামনের দিকে ঝুঁকে সে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে বাজারের মুখে একটা নতুন দোকানের চেহারা দেখছিল। কাঠের সবুজ জাফরি, সত্ত রঙ ধরানো দেওয়াল,

নতুন সাইনবোর্ড, লিপটন চায়ের মস্ত বিজ্ঞাপন। দেখতে দেখতে দোকান ছাড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে গেল।

আর একটু এগুতেই সুরযপ্রসাদের দোকান। রমলাকে দেখা গেল ; দোকানের সামনে টিনের চেয়ারে বসে আছে।

শীতাংশু হাত বাড়িয়ে দেখাল, "ওই যে রমলাদি।"

কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিচ্ছিল সুমিত্রা।

৩

শীতাংশু তখনও হাসছে।

সুমিত্রা বিছানায় বসে; গায়ের কাপড় সামান্য অগোছালো, পায়ের দিকের চাদরটা এলোমেলো হয়ে আছে। ছেলেমানুষের মতন ভয়; একেবারে যেন আঁতকে উঠেছিল সুমিত্রা; আর-একটু হলেই বুঝি চেঁচিয়ে উঠত।

স্ত্রীর সঙ্গে খুব একটা মজা করা গেছে, সেই মজা উপভোগ করতে করতে শীতাংশু বলল, "বাব্‌বা, তুমি একেবারে সাপে কামড়ানোর মতন লাফিয়ে উঠলে! আর-একটু হলেই তোমার হাতের ঝাপটায় আমার নাকটি যেত···।"

সুমিত্রা কথা বলল না। সে ভীষণ চমকে উঠেছিল, ভয়ও পেয়েছিল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসার পর চোখের সামনে যতক্ষণ না শীতাংশুর চেহারা স্পষ্ট হয়েছে, তার বিমূঢ় বিস্মিত ভীত ভাবটা কাটে নি। এখন ক্রমশ সে স্বাভাবিক হয়ে আসছিল।

"খুব ঘুমোলে! একেবারে বিকেল পাঁচটা।" শীতাংশু এবার গায়ের জামা খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে আলনায় রাখছিল।

বিছানার পাশ থেকে সুমিত্রা শাড়ির আলগা আঁচল টেনে নিল। এখন তাব একটু লজ্জাই হচ্ছিল। সে এত ভয় পেয়ে গেল কেন? ছি ছি! লজ্জা পেয়েছিল বলেই শীতাংশুর ওপর রাগের ভাব করল। "ঘুমন্ত মানুষকে এ-ভাবে কেউ চমকে দেয়? তোমার যে কী বুদ্ধি—!"

জামা রেখে বিছানায় এসে বসল শীতাংশু। "কি জানি বাবা, এ-রকম তো কোথাও শুনি নি—জাগন্ত বউকেই চুমু খাওয়া উচিত, ঘুমন্ত বউকে চুম্বন নিষিদ্ধ।" শীতাংশু মজার গলা করে হাসল।

সুমিত্রা ভুরু চোখ কুঁচকে ভর্ৎসনার ভাব করল। "আহা, ইয়ার্কি!"

"ইয়ার্কি কি! তুমি অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছ। সাইকেলের ঘন্টি বাজাতে বাজাতে বাড়ি এলাম, বারান্দায় যখন সাইকেল রাখছি তখনও ওয়ার্নিং দিয়ে বেল বাজিয়েছি। ঘরে ঢুকলাম, দেখি অসাড়ে ঘুমোচ্ছ; ডাকলাম—"

"মিথ্যে কথা বলো না। তুমি ডাকো নি!"

"কি করে বুঝলে ডাকি নি? তুমি তো ঘুমোচ্ছিলে—"

"যেমন করেই বুঝি, আমি ঠিক জানি তুমি ডাকো নি!…একটু অসভ্যতা করার সুযোগ পেলে তুমি ছাড়! তোমায় চিনতে আমার বাকি আছে!" সুমিত্রার চোখ-মুখের ভাব সহাস্য হয়ে উঠেছিল।

শীতাংশু হেসে ফেলল। বলল, "অসভ্যতা করার চান্স কেউ ছাড়ে না, মাইডিয়ার। তুমি যে সভ্যতা করে ঘুমোচ্ছিলে তার প্রমাণ কি? হয়তো মটকা মেরে…"

পায়ের কাছ থেকে চাদর গুটিয়ে শীতাংশুর গায়ের দিকে ছুঁড়ে মারল সুমিত্রা। "বাজে কথা বলো না। মটকা মারতে আমার বয়ে গেছে—"

"তা অবশ্য ঠিক। যে ভাবে ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতন ছিটকে উঠলে মটকারা ওভাবে ওঠে না।"

"বারে, আমি কি করে জানব তুমি!" সুমিত্রা কেমন আবছা লজ্জা ও অনুরাগের গলায় মধুর মুখ করে বলল, "এতদিন পরে হঠাৎ… আচমকা যদি মুখের ওপর কেউ…" কথাটা আর শেষ করল না, চোখের দৃষ্টিতে বাকিটা বুঝিয়ে দিল। তারপর মুখের হাসি আরও একটু ইঙ্গিতপূর্ণ করে বলল, "অভ্যেস নেই তো; তাই একটু চমকাতে হল।"

শীতাংশু খোলা গলায় হেসে উঠল। জবাবটা বেশ দিয়েছে সুমিত্রা। হাসতে হাসতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে এখন

অত্যন্ত সুখী লাগছিল। সুখী এবং তৃপ্ত। একবেলার মধ্যেই বাড়িটা কেমন ভরে যাওয়ার মতন লাগছে। এই ঘর কাল এক রকম ছিল, আজ একেবারে অন্য; মনে হচ্ছে এই ঘরের অন্য আবহাওয়া তৈরী হয়ে গেছে। এখন কোথাও যেন ফাঁকা লাগছে না।

বিছানায় বসে মাথা নুইয়ে পায়ের জুতো খুলতে লাগল শীতাংশু। "ঘুমিয়ে উঠে কেমন লাগছে?"

"ভালই।"

"শরীর ঝরঝরে?"

"না গো, বরং আলসেমি লাগছে।" হাই তুলে সুমিত্রা ঘুমের আলস্য ভাঙল। খোলা ছড়ানো চুলের একগুচ্ছ পিঠ থেকে বুকের কাছে টেনে আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে টেনে নিচ্ছিল আঁচড়াবার মতন করে; বলল, "অত চান করে, তারপর অবেলায় এই ঘুম; এখন দেখছি টাগরা জ্বালা করছে।"

"নতুন জলে ঘণ্টাভোর চান করলে ওই রকমই হবে। এরপর চোখ জ্বালা, তারপর মাথা ধরা। দেখো বাবা, সর্দিজ্বর বাঁধিয়ে বসো না। দুটো স্যারিডন মেরে দাও এই বেলা।" শীতাংশু জুতোর মধ্যে মোজা গুঁজে ঘরের এক প্রান্তে জুতো রাখতে গেল।

সুমিত্রাও বিছানা ছেড়ে উঠল। ছোট করে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল। বাঁ হাতের ঝটকায় পিঠের চুলগুলো ছড়িয়ে নিল, যেন আরও একটু চুল না শুকিয়ে নেওয়া পর্যন্ত তার মন ভরবে না।

ট্রাউজারের পকেটে হাত পুরে শীতাংশু তার ঘরে পরার চটি-জোড়া খুঁজল। সুমিত্রা এখনও ঘর গুছোতে পারে নি, কিছু কিছু রেখেছে সাজিয়ে, বাকি মালপত্রের খানিক এঘরে খানিক ওঘরে ছড়ানো। "আমার রবারের চটি জোড়া কোথায় ফেললে?"

"ফেলে দিয়েছি। সত্যি, তুমি এ ক-মাস খুব পয়সা জমালে—!" সুমিত্রা জানলার দিকে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখে নিচ্ছিল।

"ফেলে দিয়েছ মানে! সত্যি সত্যি ফেলে দিয়েছ?"

"দেব না তো কি, ওই ছেঁড়া চটি ঘরে রেখে দেব !···একজোড়া বাথ-স্লিপার কিনতে ক শ' টাকা লাগে যে, ওই কুচ্ছিৎ চটিটা শোবার ঘরে রেখে দিয়েছিলে ?"

শীতাংশু স্ত্রীর দিকে তাকাল, ক'পা এগিয়ে এল সামনে। বলল, "টাকা নয় গো, দোকান ! এটা তো তোমাদের কলকাতা শহর নয় যে বাটার রাজত্ব ছড়িয়ে আছে, কিংবা শহুরে জায়গা নয় যে বাজারে জুতোর দোকান পাবে। খুব কাজের কাজ করেছ ! এখন খালি পায়ে ঘুরি।"

বাইরে বারান্দাতেও রোদ নেই, বাগানের কোথাও রোদ দেখা যাচ্ছিল না ; অথচ রোদের আভা যে এখনও মোছে নি বোঝা যাচ্ছিল। সুমিত্রা বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই বলল, "খালি পায়ে ঘুরতে হবে না, আমি তোমার জন্যে একজোড়া নাগরা কিনে এনেছি।"

"নাগরা ! সে তো এক মেয়েরা পরে আর যাত্রার রাজারা পরে।"

"আজকাল কলকাতায় খুব চল হয়েছে।···সেই তোমার আগেকার দিনের মেয়েদের পায়ে দেবার মতন নাগরা নয়, মশাই। বেশ সুন্দর···। বের করে দেবো'খন, দাঁড়াও আসি একটু বাথরুম থেকে।" সুমিত্রা জানলার পাশ থেকে সরে এসে টেবিলের গা ঘেঁষে দাঁড়াল দু মুহূর্ত, ঘরের মধ্যেটা দেখল, বেশ ছায়া হয়ে আসছে। শীতাংশুকে বড় ভাল লাগছিল দেখতে। সামান্য কালচে ছায়ার মধ্যে লম্বা ছিপছিপে গড়নের যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে, গায়ে গেঞ্জি, খালি পা, ট্রাউজারের পকেটে হাত—তাকে এতদিন না দেখার দুঃখ এখন কেমন আনন্দ হয়ে মন আরও কোমল করে তুলছিল। এমন কি সুমিত্রার মনে হল, যদি সত্যিই এই অবেলার বেলায় তার ঘুম ভেঙে যেত, অথচ ঘুমের আলস্য থাকায় সে বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে থাকত, শুয়ে শব্দ শুনত সাইকেলের ঘন্টির, অনুভব করতে পারত শীতাংশু ফিরেছে, তবু সে শুয়েই থাকত, বিছানা ছেড়ে উঠত না, শীতাংশু ঘরে আসত, ঘরে এসে সুমিত্রাকে ঘুমন্ত ভেবে বিছানার

পাশে বসত, তারপর এই অবেলার আলোয় দেখত স্ত্রীকে, দেখতে দেখতে একসময় মুখ নামিয়ে আদর করে ঠোঁটে চুমু দিত, সুমিত্রা তখনও ইচ্ছে করেই নড়ত না, সে জেগে আছে জানাত না, না জানিয়ে অনেক দিন পরে স্বামীর ভালবাসা এবং মমতার স্বাদ নিত, তবে—তবে কী সুন্দরই না লাগত!

"কি গো, কি হল? হঠাৎ স্ট্যাচু হয়ে গেলে যে—!" শীতাংশু বলল, "কি দেখছ?"

সুমিত্রার অন্যমনস্ক ভাবটা কেটে গেল। বলল, "কিছু হয় নি। তোমাকেই দেখছিলাম।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বাতিটা জ্বালব নাকি?" শীতাংশু রহস্য করে বলল।

কথাটা কানে তুলল না সুমিত্রা। বলল, "অনেক দিন পরে কাউকে দেখলে কেমন লাগে, না—?" বলেই হঠাৎ সুমিত্রার কি মনে পড়ল।

"খুব ভাল লাগে।" শীতাংশু হালকা গলায় জবাব দিল।

"ভা—ল!" মনে হল সুমিত্রা তার চিন্তা ভাবনা হারিয়ে ফেলে কেমন যেন প্রশ্নের মতন করে বলল। কোথাও কি যেন আছে একটা—তার ভাবনাকে এলোমেলো করছিল। এখন তার মনে ওই চিন্তাটা বার বার আসছে: সে কেন তখন অমন করে ভয় পেয়ে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছিল? কেন? এ-বাড়িতে শীতাংশু ছাড়া আর কে আছে তার কাছে আসবে?

"তুমি যেন আজ চা খাবে বলে মনে হচ্ছে না।...যাও, বাথরুম থেকে এস। আমি চা করছি।" শীতাংশু বলল।

"তোমার সেই মোহন কোথায়?" সুমিত্রা তখনও অন্যমনস্ক।

"কই, তাকে তো দেখলাম না।"

"একটু ডেকে চায়ের জল চড়াতে বল, আমি আসছি।"

সুমিত্রা বাথরুমের দিকে চলে যাচ্ছিল, শীতাংশু বলল, "আজ সন্ধ্যে

বেলায় আবার তুমি জিনিসপত্র খুলে গুছোতে বসবে, নাকি কালকে করবে? থাক না আজ।"

"দেখি।" সুমিত্রা চলে গেল।

এখানে সন্ধ্যে হয়ে আসার চেহারাটা অন্য রকম। চারপাশ থেকে ক্ষিপ্র হাতে সন্ধ্যাকে নষ্ট করার আয়োজন কোথাও নেই। যেমন করে রাত্রিশেষে সকাল ফুটে ওঠে, বেলা মরে যাবার পর ধূসর ছায়ার গায়ে তেমন করেই ফুটে ওঠে সন্ধ্যা। চারপাশের স্বচ্ছ ছায়া ক্রমশ ঘন ও কালো হয়ে আসছে, বাতাস হুহু করে বয়ে যাচ্ছে, খাঁ খাঁ মাঠ, পাহাড়ের দিক থেকে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা ভেসে এসে আবহাওয়ায় মিশে গেল, অন্ধকার জমে উঠল ক্রমে, সন্ধ্যা হল। এই সন্ধ্যা গম্ভীর ও বিশাল। নিরালোক, নিঃশব্দ এই সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে থাকলে সহসা কেমন বেদনা বোধ হয়। অথচ কিছুক্ষণ আগে, যখন পশ্চিমের প্রান্ত ঘেঁষে সূর্য ডুবে যাচ্ছিল, তার বিরাটাকার দেহের রক্তিম আভায় আকাশের উঁচু উঁচু মেঘগুলি চীনে সিঁদুরের মত লাল হয়ে ছিল, তখন কত সুন্দর লাগছিল। সুমিত্রা মুগ্ধ চোখে ওই বালির চরের মতন ছড়ানো মেঘগুলি দেখছিল, কোনও মেঘের আঁচলে সোনার জলের পাড় বসেছে, কোথাও বা জরির মতন কাজ হয়েছে। আঙুল তুলে তুলে শীতাংশুকে দেখাচ্ছিল সুমিত্রা। 'সত্যি, এখানে আকাশ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দেখো, ওই—ওই যে রাজহাঁসের গলার মতন মেঘটা দেখাচ্ছে, সরু—লম্বা, ওই মেঘটার পাশে কেমন একটা ছোট্ট তুলতুলে মেঘ, যেন ওই মেঘটার বাচ্চা!...একেই বলে ভগবানের সৃষ্টি।' বলতে বলতে সুমিত্রা থামল। গোধূলির অন্তিম মুহূর্তটি এবার মরে যাচ্ছে দ্রুত। লালের প্রাঙ্গণ জুড়ে কালোর জল এসে গেছে থই থই; ইস্পাতের মতন রঙ ধরল কি ধরল না, সূর্য ডুবে গেল। তারপর কয়েক পলকের মধ্যেই আকাশ জুড়ে কালোর ঢল নামল, মেঘ হারিয়ে গেল, দিগন্ত যেন ডুবে গেল অন্ধকারে।

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুমিত্রা সহসা এক বেদনা বোধ করল। তার মনে হল, এই অন্ধকার বড় গভীর, এর শেষ নেই। এখানে সব লুপ্ত হয়ে যেতে পারে, তার তিরিশ বছরের জীবন, এই সংসার, প্রেম, স্বামী—সমস্তই ওই অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যেতে পারে।

শীতাংশু পাশে বসেছিল। সুমিত্রা শিশুর মতন ভীত হয়ে হাত বাড়িয়ে স্বামীকে স্পর্শ করল, করে স্বস্তি পেল। দীর্ঘক্ষণ ধরে যে পাখিগুলি গাছের মাথায় কলরব করছিল, তাদের গলা এখন শান্ত হয়ে এসেছে। বাতাসে ঈষৎ শীত ছিল।

"অন্ধকার হয়ে এলে এখানে কেমন গা ছমছম করে, না গো?" সুমিত্রা বলল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, মৃদু গলায়।

শীতাংশু অন্ধকারের দিকে তৃপ্ত নয়নে তাকিয়েছিল। বলল, "আলো হইচই থেকে সবে এসেছ কিনা! আমারও প্রথম প্রথম ভারী বিশ্রী লাগত, এখন সয়ে গেছে, ভাল লাগে।"

একটু যেন কি ভাবল সুমিত্রা, বলল, "আমরা যখন বহরমপুরে থাকতাম—"

"সেখানে এ-রকম ফাঁকা কোথায়?···ভাল কথা, সেই নির্মলকে তোমার মনে আছে? আমার সঙ্গে কাজ করত।"

"হ্যাঁ, বেশ মনে আছে।"

"নির্মল এখন পুনায়। ভাল চাকরি পেয়ে চলে গেছে। নির্মল আবার বিয়ে করেছে।"

"আবার মানে—!"

"ওর আগের বউ তো ঝগড়াঝাঁটি করে ওর সঙ্গে থাকত না। খুব সম্ভব ডির্ভোস হয়ে গেছে। আমায় সে-সব কিছু লেখে নি, বিয়ের খবরটাই জানিয়েছে।"

সুমিত্রা কথা বলল না। তার ভাল লাগল না।

"চলো ঘরে যাই, রাত হয়ে আসছে।" সুমিত্রা বলল, "তুমি বাপু বারান্দার বাতিটা জ্বেলে দাও।"

শীতাংশু উঠল, অন্ধকারে তার পায়ের শব্দ শোনা গেল, তারপর বাতি জ্বলে উঠল বারান্দায়। একটা ডেকচেয়ার, নতুন মোড়া, দুজনের চায়ের পাত্র—এছাড়া বারান্দায় কিছু নেই।

সুমিত্রা চায়ের বাসন কুড়িয়ে নিল। বলল, "এই কোয়ার্টারটা একেবারে একটেরে, নয়তো এত ফাঁকা লাগত না।"

"একটেরে ঠিক নয়, খানিকটা সামনে এগিয়ে রয়েছে বলে এ-রকম দেখায়। পেছনে হলে শর্মাদের সঙ্গে এক লাইনে হত।"

"ওদের কোয়ার্টারগুলো অন্য রকম দেখায় কেন গো?"

"এর চেয়ে একটু ছোট, সিংগল ইউনিট। এটায় দুটো ঘর—শোবার, বসবার; ওদেরগুলোতে বসবার ঘর নেই।" বলে সুমিত্রার সঙ্গে ঘরের মধ্যে যেতে যেতে হেসে বলল, "শোবারও সঙ্গী নেই।"

সুমিত্রা ঘাড় তুলে বাঁকা চোখে স্বামীকে দেখল।

ঘরে পা দিয়ে বাতি জ্বালাল শীতাংশু। শোবার ঘরের সঙ্গে গা লাগিয়ে বসবার ঘর, মোটামুটি বড়ই বলা যায়; লম্বার দিকটা সামান্য বেশী, চওড়া হয়তো একটু কম, জানলা-টানলা শোবার ঘরের সমান সমান। উত্তরের দেওয়াল ঘেঁষে রান্নাঘরের দরজা, রান্না আর ছোট্ট ভাঁড়ার, একটু কলতলা মতন আছে পেছনে।

বসবার ঘরের একপাশে শীতাংশুর সাইকেল রাখা রয়েছে, একটা তক্তপোশ, সুমিত্রার বয়ে আনা কিছু মালপত্র পড়ে আছে এক ধারে, একটা ভাঙা বেতের চেয়ার, কিছু ময়লা কাপড়চোপড়ও। এতদিন শীতাংশুর ভাঁড়ারও ছিল ওই ঘরটা; চাল রাখার একটা বিস্কুটের বড় টিন, কৌটো দু-চারটে, মাটির সরায় ডাল, পিঁয়াজ, নুন, চায়ের টিন, চিনির কৌটো, দুধের পাত্র, বেতের সাজিতে কিছু ডিম, এক কৌটো মাখন—সবই এখনও যেমন কি তেমন পড়ে আছে। তক্তপোশের ওপরেই পড়ে আছে সব। কাচের ক'টা বাসন, কাপ প্লেট, কাচের গ্লাসও উপুড় করে রাখা রয়েছে। আজ সুমিত্রা এ-সবে হাত দেয় নি। হাত দেবার মতন সময় পায় নি। ঘরদোর দেখে, ব্যবস্থাপত্র জেনে

নিয়ে আজ সে রান্নার ঘর এবং ভাঁড়ারের জায়গাটা মোহনকে দিয়ে ঘষে মেজে ধুইয়েছে। জল থিকথিক করছিল বিকেলেও; হয়তো এতক্ষণে শুকিয়ে এসেছে, সারা রাতে আরও শুকিয়ে খটখটে হয়ে থাকবে। কাল সকাল থেকে সংসার গুছোতে বসবে সুমিত্রা।

চায়ের এঁটো কাপ একপাশে রেখে দিয়ে সুমিত্রা বলল, "একটা ছোট মতন টেবিল যোগাড় করতে পারবে?"

"কি করবে টেবিল? এখানে কিছু করতে হলে শর্মাকে ধরবে। এ-সব ব্যাপারে শর্মাই অগতির গতি।" শীতাংশু সিগারেট ধরাল। সিগারেট ধরাতে গিয়ে বোধ হয় তার চোখে দেশলাইকাঠির মাথা ভেঙে বারুদের একটি স্ফুলিঙ্গর তাত লেগেছিল, শীতাংশু চোখের পাতা রগড়াতে লাগল।

সুমিত্রা ঘরের চারপাশ দেখছিল, কোথায় কি রাখবে ভাবছিল। বলল, "একটা টেবিল থাকলে খাওয়ার টেবিল করতাম। ওই তক্তপোশটা যেমন আছে থাক, সরু মতন তো, ওর ওপর সতরঞ্জি পেতে আমি চাদর বিছিয়ে দেব, মনিপুরী একটা সুন্দর বেড-কভার আছে আমার, মানুষজন এলে বসতে পারবে। তা ছাড়া দুটো মোড়া, তোমার একটা চেয়ার—মোটামুটি গুছিয়ে নেবো'খন।…হ্যাঁ গো, তা তোমাদের শর্মাকে বললে একটা টিপয় মতন করে দেয় না?"

"বলো না তুমি, ওকে যা বলবে করে দেবে। ওয়াণ্ডারফুল ছেলে। খালি মাঝে-সাঝে ওকে একটা দুটো ডিমের ওমলেট খাইও।" শীতাংশু হাসল।

অবাক হল সুমিত্রা। শুধলো, "মাত্র ডিমের ওমলেট! ব্যাপারটা কি?"

"শর্মাদের বাড়ি খুব গোঁড়া বেহারীর। আমিষ ছোঁয় না। তা শর্মা একটু ডিমটিম ভালবাসে। মাছ, মাংস খায় না। আমি ওকে এন্তার ডিম খাইয়েছি এই ক'মাসে। জাত মেরে দিয়েছি।" রগড় করে করে বলছিল শীতাংশু।

"ছি ছি, এ খুব খারাপ। তোমার মাথায় যত বদবুদ্ধি। বেচারীর বাড়িতে একটা জিনিস মানা হয়, তুমি তার জাতধর্ম নষ্ট করলে…"

"নাও নাও, ডিম খাবে তাতে আবার জাত!…আজকাল কত বেহারী মাছ-মাংস পর্যন্ত উড়িয়ে দিচ্ছে।"

"সে তো নিজের ইচ্ছেয়। নিজের ইচ্ছেয় মানুষ যা করুক সে বুঝবে—"

"আর শর্মা বুঝি আমার ইচ্ছেয় ডিম খায়!" শীতাংশু অদ্ভুত এক মজার মুখ করল। সামান্য হেসে হঠাৎ বলল, "দেখো, জাতধর্ম বলো, স্বভাবচরিত্রই বলো, আর তোমার—কি বলে বিশ্বাসটিশ্বাসই বলো—এ কেউ কারও মারতে পারে না। যা মারা যায় সবই নিজের ইচ্ছেয়।"

কথাগুলো এমন করে বলল শীতাংশু যেন এ-বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই, সে জানে, তার এ-রকম বহু অভিজ্ঞতা আছে যাতে দেখেছে কোনো লোভেই মানুষকে ভোলানো যায় না, যদি না স্বেচ্ছায় সে ভোলে। সুমিত্রা শুনল কথাগুলো। তার ভাল লাগল না।

শীতাংশু পা বাড়িয়ে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুমিত্রা দাঁড়িয়ে থাকল। কথাটা তখনও তার মনের ওপর ভাসছিল, তলায় কোনো অস্বস্তি হচ্ছে, যেন অনেককালের পুরোনো কোনো ভাঙা হাড়ে, কিংবা কাটা জায়গায় সে হঠাৎ ব্যথা বোধ করছে।

শোবার ঘরে গেল শীতাংশু, বসার ঘরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সুমিত্রা। বেশ অন্যমনস্ক, বিমর্ষ। ও-ঘরে শীতাংশু যেন কিছু টানাটানি করছে সুটকেশ কিংবা ট্রাঙ্ক—শব্দটা সুমিত্রার কানে যাচ্ছে, মন নেই। খুবই আশ্চর্য, মনেরও কোথাও উঁচু মাঠ আছে, জল জমলে ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে নিচুতে নেমে যায়।

ওঘর থেকে শীতাংশু ডাকল।

নিশ্বাসটা বুঝি বুকের মধ্যে ক্রমশ জমছিল। দীর্ঘ করে নিশ্বাস ফেলল সুমিত্রা, আস্তে আস্তে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

শীতাংশু কিছু গৃহকর্মে হাত দিয়েছে। সুমিত্রা যেমন করে বলেছিল, ট্রাঙ্ক সুটকেশ সেইভাবে পশ্চিমের দেওয়াল ঘেঁষে রেখেছে; আলনাটা সরিয়ে দিয়েছে বাথরুমের দরজার দিকে। একটা টেবল্-ল্যাম্প লাগাবার আয়োজন চলছে: কিছু টুকটাক যন্ত্রপাতি টেনে নিয়ে চেয়ারে বসে টেবিলে ঝুঁকে কাজ করছিল শীতাংশু। বলল, "কাজের সময় দরকারী জিনিসটাই পাওয়া যায় না, বুঝলে। আমার কাছে একটা বিলিতী গ্রীণ-হোআইট শেড ছিল, কোথায় যে রেখেছি, নাকি ভেঙে ফেলেছে মোহন বুঝতেই পারছি না।"

সুমিত্রা কথার জবাব দিল না। শীতাংশুর মুখের ডান পাশটা দেখা যাচ্ছিল। লম্বা, আধ-ফরসা মুখ, শক্ত দীর্ঘ নাক, চওড়া কপাল, মাথার চুল কোঁকড়ানো। দেখতে ভাল লাগে। মানুষটা চিরকালই এই রকম, অন্তত সুমিত্রা যখন থেকে দেখছে: সাধা-সিধে হাসিখুশী। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে, অনেক সয়েছে, হাহুতাশ করে তার গল্প বার বার শোনাতে চায় না। কোথাও যেন কোনো মালিন্য সে রাখতে চায় না। বড় রকমের কোনো বাসনা ওর নেই, বড় ধরনের সুখসমৃদ্ধিও আশা করে না। সাধারণ যা, নিতান্ত মানুষে বোঝে, মানুষে চায়—তার বেশী কিছু যেন ও চায় না। বলে বেশী আশা করতে নেই বুঝলে, যারা বেশী বেশী চায় তারা বেশী বেশী গোঁত্তা খায়!

কে জানে কেন, দুর্বোধ্য এক মমতা ও মায়ার বশে সুমিত্রার ইচ্ছে হল স্বামীর খুব ঘন সান্নিধ্যের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। পা পা করে এগিয়ে গেল ও; শীতাংশুর চেয়ারের পাশে দাঁড়াল, তারপর আস্তে আস্তে পিঠ ঘাড় ছুঁয়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়াল। শীতাংশু ঘাড়ের ওপর সুমিত্রার নরম বুকের স্পর্শ পাচ্ছিল।

"তুমি এবার তৈরী হয়ে নাও।" শীতাংশু বলল।

সুমিত্রা যেন কানে কথাটা শুনল না। আরও একটু ঝুঁকে পড়ল, আরও গভীর করে অবলম্বন করল স্বামীকে। মাথায় মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

"এই, কি করছ? সুড়সুড়ি লাগছে।" শীতাংশু ঘাড়পিঠ কুঁচকে ফেলল। ফেলে যতটা সম্ভব ঘাড় ফেরাল।

"লাগুক সুড়সুড়ি।" সুমিত্রা স্বামীকে আদর করছিল, আদর করার সময় তার মনে হচ্ছিল, শীতাংশুর মাথা তার বুকের মধ্যে শিশুর মতন মনে হচ্ছে।

শীতাংশু আরও একটু মুখ ঘোরাল, সুমিত্রার বুকের স্পর্শ তার গালে লাগছে। "অনেক দিন পরে খুব একটা চেনা গন্ধ পাচ্ছি—" মৃদু করে সুমিত্রার বুকে গাল ঘষছিল শীতাংশু, গলার স্বরে আবেশ ও তৃপ্তি ফুটেছে, "তোমার সব সেই রকম আছে।"

"আহা···!"

"আহা নয়, সত্যি। তুমি যেমন ছিলে তেমনি আছ!"

"বোকার মতন কথা বল না। তিন চার মাসে আমার সব বদলে যাবে নাকি?···মাথায় একেবারে ছাই।" সুমিত্রা চুল টেনে দিল শীতাংশুর আলতো করে, ডান হাত বাড়িয়ে একটু কাতুকুতু দিল, দিয়ে নিজেই হাসল, তারপর সোজা হয়ে গেল।

শীতাংশু আবার বলল, "এবার কিন্তু তৈরী হয়ে নাও। রাত হয়ে যাচ্ছে। চুলটা পর্যন্ত বাঁধ নি এখনও, সেজেগুজে বেরুতে তোমার আটটা বেজে যাবে। তারপর ও বাড়ি গিয়ে একটু বসা হবে না, শুধু খাব আর ফিরব। কী বিশ্রী দেখাবে!"

"আমার আর যেতে ইচ্ছে করছে না।" সুমিত্রা স্বামীর কাছ থেকে সরে যেতে যেতে বলল।

"আমার তো মনে হচ্ছে আজ ও-বাড়িতে চর্ব্যচোষ্য হবে। ফাউল-টাউল রাঁধবেন রমলাদি; সকালে তেমন জুত করে খাওয়াতে পারেন নি।" শীতাংশু হালকা গলায় বলল।

"তা তুমি একাই যাও না—" আরও একটু দূরে সরে গিয়ে সুমিত্রা যেন তার মাথা আঁচড়াবার চিরুনি খুঁজছিল।

"পাগল নাকি! সুখ আর সম্পদ সব সময় বউয়ের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়—নয়তো কালীঘাটের ছাগল হতে হবে, বুঝলে। নাও, চটপট নাও;…এই তোমার টেবল-ল্যাম্প রেডি।…কই, দেব নাকি তোমার চুল বেঁধে—চলে এস—দেখি সেই পুরোনো প্র্যাকটিসটা মনে আছে কি না!"

চিরুনি খুঁজে পেয়ে সুমিত্রা চুল আঁচড়াতে শুরু করেছিল। মনে পড়ল সন্তান নষ্ট হয়ে যাবার পর সুমিত্রা যখন বেশ অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল, তখন সর্বক্ষণই প্রায় সঙ্গ দিত শীতাংশু, সেবা দিত। স্নেহের বশে সে স্ত্রীর মাথার চুল আঁচড়ে বিনুনি করে দিয়েছে দু-চার দিন, মজার সেই বিনুনি-শিক্ষার কথা মনে পড়লে হাসি পায়।

পুরোনো দৃশ্যটা জলের ঝাপটার মতন এল, হয়তো কোথাও একটু আর্দ্র হল মন। সুমিত্রা সামান্য অন্যমনস্ক গলায় বলল, "আমার সত্যি আর যেতে ইচ্ছে করছে না। কি হয় না গেলে?"

"না গেলে কেলেঙ্কারী হবে।…রমলাদি নিজেই এক্ষুনি ছুটে আসবেন। নাও, তাড়াতাড়ি নাও। ও-বেলা মাস্টারমশাই বাড়িতে ছিলেন না। এ-বেলা থাকবেন। গিয়ে একটা টিপ করে প্রণাম করে দিও, তাতেই উনি খুশী হয়ে যাবেন।…খুব চমৎকার লোক, দেবতুল্য। একমাত্র ট্রাবল, গম্ভীর; কথা প্রায় বলেনই না।…তোমার সঙ্গে অবশ্য বলতে পারেন, কি জানি।"

সুমিত্রা জানলার দিকে মুখ করে চুল বাঁধছিল।

৪

চিনতে সময় লাগল ক' মুহূর্ত। চোখ এবং মনের মধ্যে দূরত্ব অনুভব করছিলেন দেবীদাস, সেখানে রাশিকৃত কুয়াশা জমে আছে যেন; যে আলোয় সচরাচর তিনি অন্য বস্তু দেখতে পান সেই আলো বুঝি দূরে পৌঁছতে পারছিল না, নিকট এবং দূরবর্তী কুয়াশায় সব আড়াল পড়ে যাচ্ছিল। অথচ মন বলছিল মেয়েটিকে তিনি চেনেন। দেবীদাস চশমার ভেতর দিয়ে স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলেন। নিস্তব্ধ এবং নির্মম কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। শেষে দেবীদাস চিনতে পারলেন।

"আরে, তুমি!" দেবীদাস বললেন।

অনেককাল আগে যখন হাত কাঁচা ছিল তখন যেন নিজের কোনো বইয়ের পাতায় নাম লিখেছিলেন, এতকাল পরে একেবারে আচমকা সেই লেখা, সেই বই চোখের সামনে মেলে ধরেছে কেউ। কোনো কোনো রেখা বা ছাঁদ ধরিয়ে দিচ্ছিল লেখাটা দেবীদাসের, অথচ দুর্বল, শুকনো, ফিকে সেই হরফকে তিনি দ্বিধা ও সংশয়ের চোখে দেখছিলেন। মনে হচ্ছিল, অথচ বিশ্বাস হচ্ছিল না। শেষে বিশ্বাস হল।

সুমিত্রা হাত তুলে নমস্কার করেছিল যেটুকু, তারপর হাত নামিয়ে নিয়েছে। দেবীদাসের দিকে এখন আর সে তাকিয়ে নেই। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, এই পরিচয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই, সৌজন্যোচিত খুশী বা হাসি তার চোখ বা ঠোঁটের কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। নিস্পৃহ, নিরাগ্রহ ভঙ্গিতে সে বসে ছিল।

দেবীদাস প্রথমে শীতাংশুর দিকে তাকালেন, তারপর রমলার দিকে। ওরা অবাক হয়েছে, দেবীদাসকে দেখছে।

শব্দ হল না, চেয়ার টেনে উনি বসলেন। "অনেক দিন—পনেরো ষোলো বছর হবে—। তারপর? তোমার দিদি কেমন আছে?"

সুমিত্রা একটু সময় কথা বলল না; হয়তো ভাবল তার কি করা উচিত। চিনেছি—এটা লুকিয়ে রেখে লাভ নেই। মনে মনে সুমিত্রা ঠিক করে রেখেছিল, যদি দেবীদাস চিনতে পেরে অচেনার ভাব না করেন তবে সেও চেনার ভাব করবে, কিন্তু ওইটুকু মাত্র, হ্যাঁ—সে দেবীদাসকে চেনে, তার বেশী নয়। উনি যদি না চিনতে চাইতেন, সুমিত্রাও জানাত না সে শীতাংশুর মাস্টারমশাইকে চেনে।

দিদির কথায় সুমিত্রা ছোট করে জবাব দিল, "ভাল আছে।"

দেবীদাস টেবিলের ওপর দু হাত রাখলেন। ডান পাশে শীতাংশু। উলটো দিকে, তাঁর এবং শীতাংশুর মুখোমুখি রমলা আর সুমিত্রা। রমলা দাঁড়িয়ে, সুমিত্রা বসে রয়েছে। দেবীদাস চেয়ারে বসার পরও শীতাংশু দাঁড়িয়ে ছিল, দেবীদাস বললেন, "বসো, তুমি বসো।"

শীতাংশু বসল। সুমিত্রার ওপর সে অসন্তুষ্ট হচ্ছিল। পথে, ঘাটে, মন্দিরে, আখড়ায়—এত তো প্রণাম, কিন্তু এখানে মাস্টারমশাইকে একটা প্রণাম করলে কি ক্ষতি ছিল! উনি হয়তো প্রণাম করতেই দিতেন না। কিন্তু এটা খারাপ হল, খুব খারাপ দেখাল চোখে। মাস্টারমশাই যখন তোমারও চেনা তখন একটা প্রণামে কী মানহানি হচ্ছিল!

দেবীদাস হাত বাড়িয়ে কাচের সাদা ডিশ তুলে নিয়ে শীতাংশুর সামনে রাখলেন। "এখন কোথায় আছে ওরা?" প্রশ্নটা যেন উভয়কেই করা হল, সুমিত্রা এবং শীতাংশুকে।

"কাঁচড়াপাড়া," শীতাংশু জবাব দিল। তার কাছে এখনও সব পরিষ্কার নয়। বুঝতে পারছে, দেবীদাসবাবুর সঙ্গে সুমিত্রাদের পরিবারের পরিচয় ছিল, কিন্তু তার বেশী কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শীতাংশু স্বাভাবিক কৌতূহল বোধ করছিল।

কাঁচড়াপাড়া শুনে দেবীদাস কেমন বিস্মিত চোখে শীতাংশুর দিকে

তাকিয়ে পরে সুমিত্রাকে লক্ষ করলেন। সুমিত্রা নীচু মুখে ছিল। দেবীদাস সামান্ত অস্বস্তি বোধ করলেন যেন, বললেন, "কাঁচড়াপাড়ায় থাকে···?" ওঁর কথাটা তেমন স্পষ্ট হল না।

শীতাংশু বুঝতে পারল। তাড়াতাড়ি বলল, "কাঁচড়াপাড়াতেই বাড়ি, বাসাবাড়ি। ওঁর স্বামী সেখানে চাকরি করেন···"

দেবীদাস কিছু বললেন না, কিন্তু বোঝা গেল তাঁর বিস্ময় ভাবটা কেটে গেছে।

দেবীদাস অভ্যাসবশে খাবারটেবিলে রমলাকে সাহায্য করছিলেন। ডিশ তুলে দিলেন, জলের গ্লাস ভর্তি করলেন, মুন দিলেন এগিয়ে, রুটির পাত্রও।

সুমিত্রার জন্যে ভাতের ব্যবস্থা করেছিল রমলা। চামচ করে ভাত তুলে দিয়ে ঘি ছড়িয়ে দিল। ঘিয়ের সুগন্ধ উঠল।

"তোমার এ বেশ ভালই হল", রমলা বলল সুমিত্রাকে, "জায়গা নতুন কিন্তু পুরোনো জানাশোনা লোক পেলে। এখন আর খারাপ লাগবে না অতটা।"

আহার শুরু হয়েছিল। আয়োজন কিছু প্রচুর নয়, কিন্তু পরিপাটি। কিছু ভাজা, খানিকটা সবজি, মাংস, সিমাইয়ের পায়েস অল্প।

খেতে বসে প্রথম কিছুক্ষণ কথাবার্তা বড় একটা কেউ বলছিল না। রমলা নীচু গলায় সুমিত্রাকে এখানের খাওয়া-দাওয়ার সুবিধে অসুবিধের গার্হস্থলি উপদেশ দিচ্ছিল: মাছ পাওয়া যায় না—কালেভদ্রে যদি জোটে, মাংসও ন' মাইল দূরে বাজার থেকে আনতে হয়, মুরগী রাখলে অবশ্য সুবিধে, বাড়িতে ডিম বেচতে আসে, শাকসব্জিও অফিসের পিয়ন দিয়ে আনিয়ে নিতে হয় বেশীর ভাগ সময়। দুধটা ভাল পাওয়া যায়, ঘি অবশ্য ভঁয়সা, কিন্তু ভাল।

সুমিত্রা শুনছিল, নিতান্ত যখন সাড়া না দিলে নয়, ছোট করে শব্দ করছিল; খাবার খুঁটছিল, খাচ্ছিল না। তার কোথাও কোনো রকম

আগ্রহ দেখা যাচ্ছিল না। বরং অনিচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছিল। আতিথ্যবশে দু'একবার রমলাকে অনুরোধ করতেও শোনা গেল ঃ তুমি কিচ্ছু মুখে দিচ্ছ না। একটু মাংস নাও···নাও না! শেষে রমলাও আর পীড়াপীড়ি করল না। বলল, "তোমার বুঝি শরীর খারাপ ?"

সুমিত্রা মাথা নাড়ল আস্তে করেঃ হ্যাঁ, তার শরীর ভাল না। খাবার টেবিল অগত্যা হঠাৎ নীরব হয়ে গেল।

এটা উত্তরের দিকের বারান্দা। মোটামুটি জায়গা আছে। এক পাশে প্যানট্রির দরজা; বারান্দার মাঝবরাবর বসার ঘর, দরজায় পরদা ঝুলছিল; দেবীদাসের বাঁ হাতের সিধে শোবার ঘর। বারান্দার এক কোণে টুকটাক জিনিস, ছোট ছোট কতক ফুলের টব রেলিঙের ধার ঘেঁষে বসানো; ক'টা সাদা চিনেমাটির পাত্র ফুলদানির মতন দেখতে—বারান্দার ছাদ থেকে তারের জাল দিয়ে ঝুলোনো, লতানো গাছ দেখা যাচ্ছিল। বারান্দার বাতিটা সাধাসিধে, সাদা শেডের তলায় মাঝারি ধরনের আলো।

চুপচাপ কিছুটা সময় কেটে গেল। সম্ভবত চারজনেই এই ধরনের নীরবতায় অস্বস্তি বোধ করছিল। দেবীদাস নিজে কম কথা বলেন, অন্য দিন হলে এটাই স্বাভাবিক বলে মনে হত। কারও মনে হত না নীরবতাটা বিসদৃশ। দেবীদাস মৃদুস্বরে দু চারটে কথা বলতেন, হয়তো রমলাকে খুব হালকা করেই কোনো রান্না নিয়ে একটু কিছু বললেন, শীতাংশুকে শীত, হিম অথবা এখানের শাকসবজির স্বাদের কথা কিছু বললেন, তারপর নিজের খাওয়া শেষ করে উঠে গেলেন। উঠে গেলে শীতাংশু যেন একটু হাঁপ ছাড়ত। রমলা হাসত। দেবীদাসবাবুর কাছে শীতাংশু যে এখনও সুবোধ ছাত্রের মতন প্রায় বোবা হয়ে বসে থাকে, রমলা যেন সেই কৌতুককর ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে হাসত। তারপর নীরবতা থাকত না। রমলা ও শীতাংশু গল্প করত। কিন্তু আজ সকলেই কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিল। দেবীদাসের খুব স্বল্প কথাবার্তা, কিঞ্চিৎ অস্বস্তি, খানিকটা অন্যমনস্কতা, এবং সুমিত্রাকে

চিনতে পেরেও কোনো রকম আতিশয্য না-দেখানো যদিও তাঁর স্বভাবের সঙ্গে বেখাপ্পা নয়, তবু যেন কেমন বেমানান মনে হচ্ছিল এখন। হয়তো এর কারণ সুমিত্রার উদাসীনতা এবং নিস্পৃহতা। দেবীদাস কি তবে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন?…রমলা কোনোও কারণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে কি না বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু সুমিত্রাকেও সে আর কিছু বলছিল না। হয়তো তার সমাদর সুমিত্রা যেরকম নিস্পৃহভাবে এড়িয়ে গেল, রমলার তা পছন্দ হচ্ছিল না।…শীতাংশু রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছিল। সুমিত্রার ওপর সে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল। সুমিত্রা এ-বাড়িতে এসে ভাল ব্যবহার করছে না। সে অসৌজন্যতা প্রকাশ করে শীতাংশুকে কেমন কুণ্ঠা ও লজ্জার মধ্যে ফেলেছে। তুমি কথা বলছ না কেন? তোমার এত বোবা সাজার কি আছে? দেবীদাসবাবুকে তুমি চেন, অথচ ওঁর সঙ্গে তোমার ছুটো কথা বলতেই বা এত আপত্তি কিসের? কাজটা তুমি মোটেই ভাল করছ না, সুমিত্রা। এঁরা কি ভাবছেন তোমাকে?

শীতাংশু যেন অন্য কিছু করার বা বলার না পেয়ে রমলার দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ যেন শীত একেবারেই চলে গেল। এ বেলাটায় ঠাণ্ডা নেই।"

রমলা চোখ তুলে শীতাংশুকে দেখল। "ফাল্গুন মাস পড়ে গেছে।"

"কবে?"

"এই তো, দিন ছুই তিন হবে।"

"…এখানে গরম পড়ে কেমন?"

"মন্দ কি। ছুপুরে লু, রাত্রে ঠাণ্ডা।"

শীতাংশু কথা খুঁজে পেল না আর। ভাববার চেষ্টা করল, কি বলা যায়। সুমিত্রার দিকে তাকাল। রমলার পাশে সুমিত্রাকে তেমন মানায় না। রমলাদির গায়ের রঙ, চোখ মুখ, গড়ন সুমিত্রার চেয়ে কত গুণ ভাল তাও বলা মুশকিল। সুমিত্রার গায়ের রঙ শ্যামলা, মুখের ছাঁদ গোল, পুরন্ত; কপাল ছোট, চোখ ছুটি ডাগর ও ঘন, ঠোঁ

সামান্য পুরু ; গাল ও চিবুকের গড়নের জন্যেই যেন সুমিত্রার মুখের অনেকখানি লাবণ্য, এবং তার চোখের জন্যে। সুমিত্রা সুশ্রী, কিন্তু সুন্দরী নয়। রমলাদি সুন্দরী। ওঁর গায়ের রঙ খুব পরিষ্কার—ফরসার সঙ্গে একটু যেন কাঁচা হলুদের মিশেল, চামড়া পাতলা, শিরা দেখা যায়। লম্বা গড়নের মুখ, কপালে ঢল আছে, চোখের তারা সামান্য নীলচে, ভুরু পাতলা, চোখ দীর্ঘ, চোখের পাতাও বেশ বড়। নাক, ঠোঁট, থুতনির মাঝখানে ঈষৎ টেপা ভাবটার মধ্যে কোনো খুঁত নেই। দীর্ঘ গ্রীবার জন্যে ওঁর সমস্ত মুখটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য পেয়েছে। শীতাংশু তার স্ত্রীর দিকে চোখ ফেরাল। সুমিত্রা যদি এখানে চুপচাপ বোবা নিষ্প্রাণ হয়ে বসে না থাকত, হয়তো তাকে আরও সুশ্রী, জীবন্ত দেখাত।

দেবীদাস আচমকা কথা বললেন। সুমিত্রার দিকে ভাল করে না তাকালেও বোঝা গেল সুমিত্রাকেই তিনি বলছেন কিছু। শীতাংশু স্ত্রীকে লক্ষ করছিল।

"তোমার মা কেমন আছেন ?"

"মা মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন !···কত দিন হল ?"

"অনেক দিন। বছর দশ।"

"ও !"

দেবীদাস আবার নীরব হয়ে গেলেন। উনি স্বল্পাহারী। আজ যেন আরও কম করে খেলেন। হয়তো শরীর ভাল না। আজ পরিশ্রম কিছু বেশী হয়েছে, সকালে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, দুপুরে ফিরতে পারেন নি, ত্রিশ মাইল দূরে একটা ডিমনস্ট্রেশন ছিল, পাটনা থেকে লোকজন এসেছিল। শীতাংশু লক্ষ করে দেখল, দেবীদাসবাবুর মুখে চোখে ক্লান্তির ভাব, ওঁর মাথায় হয়তো অফিসের কোনো চিন্তা। অফিস নিয়ে বড় বেশী ভাবেন উনি।

রমলা হাত বাড়িয়ে জলের পাত্র টানতে গিয়ে নাগল পেল না। "দাও তো···" রমলা বলল।

দেবীদাস কাচের জগ্‌টা এগিয়ে দিলেন। "আমি উঠি। তোমরা ধীরে সুস্থে খাও," বলে সামান্যক্ষণ বসে থেকে তিনি ওঠার জন্যে চেয়ার সরালেন, এবারে শব্দ হল; সুমিত্রার দিকে তাকালেন দেবীদাস, "তুমি কিছু খেলে না। এখানের ক্লাইমেট ভাল, যা খাবে হজম হয়ে যাবে।...আচ্ছা আমি উঠি; তোমরা বস।" দেবীদাস চেয়ারের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেলেন। তাঁব পায়ের স্লিপারের শব্দ হচ্ছিল। প্যানট্রিতে গিয়ে হাতমুখ ধুলেন, তারপর আবার বারান্দা দিয়ে শোবার ঘরের দিকে চলে যেতে যেতে রমলাকে বললেন, "দশটায় আমাকে দুধ দিয়ো। অল্প করে দিও আজ।"

উনি চলে যাবার পর অল্প সময় শীতাংশু কেমন এক স্তব্ধতা অনুভব করল। আগে কখনও এ-রকম অদ্ভুত লাগে নি। রমলার দিকে তাকিয়ে বলল, "উনি আজ খুব টায়ার্ড।"

বোধ হয় রমলা তেমন খেয়াল করে শোনে নি কথাটা; বলল, "কে?" বলে সুমিত্রার দিকে তাকাল, যেন শীতাংশু সুমিত্রার ক্লান্তির কথা বলছে।

শীতাংশু কুণ্ঠিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলল, "আমি ওঁর কথা বলছি।"

"ও!...হ্যাঁ, আজ খুব ঘোরাঘুরি গেছে।"

"উনি নাকি বাইরে যাবেন?"

"কই না! শুনি নি।"

"অফিসে শুনছিলাম আমি।"

সুমিত্রা জলের গ্লাস তুলে নিয়ে সামান্য জল খেল। তার হাতের বালায় এক টুকরো আলো পড়ে পলকের জন্যে বালাটা খুব উজ্জ্বল দেখাল।

রমলা বলল, "তোমরা বরাবর কলকাতায়?"

"আগে না; আমার আট দশ বছর বয়েস যখন তখন থেকে কলকাতায়।" সুমিত্রা জবাব দিল।

"দু বোন?"

"দু বোন, এক ভাই।"

"দুপুরে আমি ভাবলাম জিজ্ঞেস করব, ভুলে গেলাম।…ভাই কোথায়?"

"কলকাতায়। চাকরি করে।"

"সবার ছোট?"

'আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট।"

রমলা এবার শীতাংশুর দিকে তাকাল যেন কি একটা বলবে বলে ভেবেছিল, হঠাৎ ভুলে গেছে। অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থেকে শেষে বলল, "আমি ক'বছর কলকাতায় ছিলাম, আপনাকে বলেছি না?"

"বলেছেন।"

"আমি যে বাড়িতে থাকতাম মনে পড়ে এখনও। পুরোনো আমলের বাড়ি, কাঠের সিঁড়ি ধপধপ কবত, জানলার সামনে দুটো মস্ত নারকোল গাছ ছিল—রাত্রে শুতে এসে গাছ দুটো দেখলে মনে হত ভূত দাঁড়িয়ে আছে—" রমলা যেন সেই ভূতের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হেসে উঠল, "আমার খুব ভূতের ভয় ছিল। এখনও আছে একটু একটু।…আপনার নিশ্চয়ই নেই?"

"না," শীতাংশু হাসল।

কৃত্রিম সন্দেহ এবং পরিহাসের চোখে কয়েক পলক শীতাংশুকে দেখল রমলা, তারপর মুখ ফিরিয়ে সুমিত্রার দিকে তাকাল। "তুমি? তোমারও ভূতের ভয় নেই নাকি?"

আস্তে করে মাথা নাড়ল সুমিত্রা—না, তার ভূতের ভয় নেই। মাথা নেড়ে রমলার দিকে চোখ তুলতেই সহসা সে লক্ষ করল, ওঁর দৃষ্টিটা একটু যেন কি-রকম, লুকোনো এক ইঙ্গিতের মতন কিছু হয়তো আছে। সুমিত্রার ভালো লাগল না। মনে হল, উনি যেন সন্দিগ্ধ।

শীতাংশু ততক্ষণে আরও সরস করে গল্প তুলল। "ভূতের ভয় দেখেছি আমার এক বন্ধুর স্ত্রীর। একশো পাঁচ ডিগ্রী গরমেও জানলা

বন্ধ করে শুত। ওদের বাড়ি ছিল শ্মশানঘাটের পথে, রাত্তিরে হরিবোল উঠলে বেচারীর আর সারা রাত…”

কথাটা শীতাংশু শেষ করতে পারল না, শব্দ হল চেয়ারের ; সুমিত্রা সোজা উঠে দাঁড়িয়েছে। রমলা দেখছিল সুমিত্রাকে।

“হাতটা ধোব।” সুমিত্রা বলল।

রমলা সামান্য অবাক হয়েছিল হয়তো, প্রকাশ করল না। বরং তারই যেন মস্ত কোনো ভুল হয়ে গেছে এমন ভাব করে বলল, “সত্যিই আমার ভুল! গল্প করে করে রাত করছি। চলো…” উঠে দাঁড়াল রমলা।

শীতাংশুর কাছে বিসদৃশ লাগল ব্যাপারটা। সুমিত্রা যেন ইচ্ছে করেই হালকা গল্প-গুজবের আবহাওয়া নষ্ট করে দিল। এখানে এসে পর্যন্ত ও বড় অসহিষ্ণুতা দেখাচ্ছে। রমলাদি এবং দেবীদাসবাবু কি ভাবছেন—কি না মনে করবেন কে জানে! স্ত্রীর ওপর শীতাংশু বিরক্ত বোধ করল।

ফেরার পথে বাড়ি থেকে বেরিয়েই শীতাংশু কথা তুলল।

“তুমি কিন্তু ওঁদের খুব ক্ষুণ্ণ করেছ।”

সুমিত্রা শুনল, সাড়া দিল না। রাস্তাটা অন্ধকার, পথে আলো নেই। শীতাংশুর হাতে টর্চ, নিতান্ত প্রয়োজনেই যেন জ্বালাচ্ছিল, অনেকটা রাস্তার ওপর আলো ফেলে একবার দেখে নিচ্ছিল তারপর নিবিয়ে পথ হাঁটছিল। কাঁচা, কাঁকর মাটির রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শীতাংশুর অন্ধকারেও অসুবিধা হবার কথা নয়। সুমিত্রার অসুবিধে হচ্ছিল, তবু বাতি জ্বেলে রাখার কথা সে বলছিল না।

সামান্য অপেক্ষা করল শীতাংশু ; সুমিত্রা কথা বলছে না দেখে আবার বলল, “তুমি ও-বাড়িতে গিয়ে এমন করলে—!”

“আমার ভাল লাগছিল না,” সুমিত্রা জবাব দিল। পর পরই বলল আবার, “তখনই তোমায় বলেছিলাম আমি আসব না, শরীর ভাল লাগছে না। তুমিই টেনে নিয়ে এলে।” ওর গলার স্বরে অপ্রসন্নতা রয়েছে।

"না এলে খারাপ দেখাত," শীতাংশু বেশ ক্ষুব্ধ গলায় বলল। "সংসারে আদর যত্ন সবাই করে না সুমিত্রা, যারা করে তাদের ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়।"

কয়েক পা চুপচাপ এগিয়ে এসে সুমিত্রা অন্য রকম গলায় বলল, "আমি আসবার সময় বলে এসেছি, উনি কিছু মনে করবেন না।··· শরীর খারাপ হলে কি করব বল ?"

শীতাংশু কথা বলল না। সুমিত্রার গলার স্বর ঘনিষ্ঠ শোনাল বলে হয়তো মনে হল যেন সে নিজেও বেশ দুঃখিত।

"মানুষের মন সব সময় কি একরকম থাকে!" সুমিত্রা বলল, "আজই সবে এলাম, কলকাতার কথাও তো মনে পড়তে পারে···"

শীতাংশু ভাবল। কথাটা সে খেয়াল করে নি আগে। বলল, "কলকাতার জন্যে খারাপ লাগছে ?"

স্বামীর গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাঁটছিল সুমিত্রা। বলল, "তা একটু লাগবে না!" বলে কি যেন মনে হওয়ায় দাম্পত্য গলায় এবার বলল, "তা বলে তোমার জন্যে কলকাতায় যেমন খারাপ লাগত তেমন নয়।"

সামনে গাছের ভাঙা ডাল পড়ে ছিল। পায়ে লাগতে শীতাংশু টর্চ জ্বালল, রাস্তা দেখে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগল অন্ধকারে।

"মাস্টারমশাইয়ের ব্যাপারটা বুঝলাম না। তোমাদের সকলকেই চেনেন দেখলাম।" শীতাংশু কৌতূহল প্রকাশ করল। "তুমি চেনা লোকের সঙ্গেও এমন অচেনার মতন ব্যবহার করলে···!"

সুমিত্রা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। যেন এ-ধরনের প্রশ্নের জবাব হয় না। শেষে বলল, "কত বছর আগের কথা, অত আমার মনে থাকে না।"

"ওঁর কিন্তু সব মনে আছে।···অঞ্জুদির কথা, তোমার মা'র কথা—"

"দিদির সঙ্গেই বেশী জানাশোনা ছিল।" সুমিত্রা গলা নামিয়ে কেমন একটু গম্ভীর গলায় বলল।

শীতাংশু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল; অন্ধকারে কিছু বোঝা গেল

না। অপেক্ষা করে শীতাংশু বলল, "তাই বুঝি কয়েকবারই অঞ্জুদির কথা জিজ্ঞেস করলেন।"

জবাব দিল না সুমিত্রা। একেবারে নির্জন, নিশ্চুপ এই রাস্তায় অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে তার এখন ভয়ের মতন লাগছিল; এ-রকম অন্ধকারে তার চোখ মন অভ্যস্ত নয়, এত নির্জনতা ওর সহ্যের মধ্যে নয়। নিজেকে অসহায় বোধ করলে যেমন ফাঁকা লাগে, বেদনা বোধ হয়, সুমিত্রার সেই রকম হচ্ছিল যেন।

শীতাংশু শুধলো, "তোমাদের পাড়ায় থাকতেন নাকি?"

"উঁ—" সুমিত্রা খুব অন্যমনস্ক।

"মাস্টারমশাই পাড়ার লোক ছিলেন?"

"না।"

"তবে?" শীতাংশু আবার টর্চ জ্বালল। সামান্য একটু এগিয়েই তাদের কোয়ার্টার। মেহেদীর ঝোপ থেকে একটা কাঠবেড়ালী এই অন্ধকারে সরসর করে ছুটে সামনের গাছে উঠে গেল। মরা শীতের বাতাসে সামান্য উষ্ণ ভাব, যেন বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে প্রথম।

"যাই বলো, তোমার কিন্তু একটা প্রণাম করা উচিত ছিল," শীতাংশু বলল, "বয়স্ক লোক; আমি যখন মাস্টারমশাই বলি, তোমাদেরও পুরোনো জানাশোনা···"

"তোমার মাস্টারমশাই, তুমি ভক্তি দেখাও। আমায় বলো না।" সুমিত্রা শীতাংশুর কথায় বাধা দিয়ে শক্ত বিরক্ত গলায় বলল।

সুমিত্রার বিরক্তির অর্থ শীতাংশু বুঝতে পারল না, স্ত্রীর অসন্তোষে বিস্মিত হয়ে অন্ধকারেই তাকে দেখার চেষ্টা করল। তার এখন কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। দেবীদাসবাবুকে যে সুমিত্রা মোটেই পছন্দ করতে পারছে না শীতাংশু বেশ বুঝতে পারছিল। সামান্য ভেবে বলল, "ব্যাপারটা কি, তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

অনিচ্ছুক, নিস্পৃহ মানুষ যেমন করে কথা চাপা দিতে চায় সুমিত্রা

যেন সেই ভাবে বলল, "কি আর, কিছু না। তোমার কিছু বুঝে দরকার নেই।"

শীতাংশু ভাবল, অনুমান করার চেষ্টা করল। দেবীদাসবাবুর মতন মানুষের ওপর কারও বিরাগ বিতৃষ্ণা থাকতে পারে ভাবতে অবাক লাগে। তবে অত বছর আগে কি ঘটেছে কে জানে? এতকাল তার জের চলাও সম্ভব নয়! পারিবারিক কোনো ঘটনা নাকি? হঠাৎ শীতাংশুর অন্য রকম এক সন্দেহ হল, সুমিত্রা বলছিল—অঞ্জুদির সঙ্গে দেবীদাসবাবুর পরিচয় বেশী ছিল। কৌতূহল এবং কৌতুক বোধ করে খুব সাধারণ গলায় শীতাংশু প্রশ্ন করল, "অঞ্জুদির সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের কিছু মন-টনের ব্যাপার ছিল নাকি?"

সুমিত্রা জবাব দিল না কথার।

শীতাংশু স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখল, যেন এখন আর তার সরল কৌতূহল ছাড়া অন্য কোনো আগ্রহ নেই; রসিকতার গলা করে বলল, "মাস্টার-টাস্টাররা ছাত্রীদের ওপর একটু সফ্‌ট্‌ হয়ে পড়ে। ওটা ন্যাচার‍্যল্। অঞ্জুদির যে রকম চেহারা এখনও, তাতে সেই বয়সে—মানে তরুণী বয়সে মাস্টারমশাই একটু দুর্বল হয়ে পড়লে বলার কিছুই নেই, ডিয়ার।..." বলে শীতাংশু রহস্যভেদ করার তৃপ্তিতে একটু হাসল, তারপর হাসির গলাতেই শুধলো, "ব্যাপারটা এই তো—?"

সুমিত্রা বুঝতে পারল সে বাড়িতে এসে পৌঁছে গেছে। পিছন দিয়ে ঘুরে আসতেই বারান্দার বাতি চোখে পড়ল। অন্ধকার থেকে আলোয় এসে সে আপাতত অনেক স্বস্তি বোধ করছে।

"কি, কিছু বলছ না যে!" শীতাংশু জিজ্ঞেস করল, "অ্যাম আই কারেক্ট?"

"হ্যাঁ; তাই।"

"ভালবাসার ব্যাপার তবে?"

"সেই রকম মনে হত।"

"মনে হত মানে—"

"জানি না।" সুমিত্রা অন্য পাশে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর একটু থেমে বলল, "তোমার মাস্টারমশাইয়ের ওপর তোমার ভক্তিফক্তি যতই থাক, আমাদের নেই। অন্তত আমার। আমার কাছে তুমি ওঁর হয়ে ওকালতি করতে এস না।"

শীতাংশু কেমন যেন দমে গেল। বলল, "কবে কোন যুগে তোমার দিদির সঙ্গে কি হয়েছে তার জন্যে এতদিন পরে তোমার অত রাগ পুষে রাখার কি আছে!...ভুলে যাও...জাস্ট্ ফরগেট ইট্।"

সিঁড়িতে পা রেখে বারান্দার ওপর উঠতে উঠতে সুমিত্রা জবাব দিল, "আমাদের পক্ষে ও-রকম একটা ইতর মানুষকে ভোলা সহজ নয়।" সুমিত্রার গলার স্বর থমথম করছিল, প্রত্যেকটি শব্দ অসম্ভব শক্ত ও তীক্ষ্ণ, অস্বাভাবিক ঘৃণাও যেন ছিল।

শীতাংশু কোনো কথা বলতে পারল না।

৫

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই শীতাংশুর সঙ্গে দেখা; দেবীদাস সামান্য অন্যমনস্ক ছিলেন, পা বাড়াতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন, মুখ তুলে বললেন, "যাচ্ছ ?"

বারান্দার ধার ঘেঁষে শীতাংশুর সাইকেল, সামান্য তফাতে শর্মাও তার সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক ওদিক তাকালে আরও কয়েকজনকে চোখে পড়ে; ছুটির বেলায় বাড়ি ফিরছে সব। দেবীদাস আজ তাড়াতাড়ি উঠেছেন একটু।

শীতাংশু বলল, "আপনার গাড়ির চাকা খুলেছে···"

দেবীদাস সামনে তাকালেন। সামান্য তফাতে শুকনো মাঠের ওপব তাঁদের অফিসের জিপগাড়িটা দাঁড় করানো। ওখানে কিশোরী এবং ইন্দ্রকে দেখা গেল। দেবীদাস দাঁড়িয়ে থাকলেন।

শীতাংশু সরে যেতে পারল না। ছুটির পর সে বাড়ি ফিরছিল, শর্মা অপেক্ষা করছে। দেবীদাসকে এখানে একা দাঁড় কবিয়ে রেখে তারা যে যার পালাবে এ যেন কেমন বিসদৃশ দেখায়।

শীতাংশু বলল, "আমি দেখে আসি কতক্ষণ লাগবে," বলে সে গাড়ির দিকে এগোতে যাচ্ছিল।

দেবীদাস বাধা দিলেন। বললেন, "ওরা ধীরে সুস্থে করুক—; তুমি যাও।"

শীতাংশু ঈষৎ কুণ্ঠা বোধ করল। দেবীদাস যদিও ব্যস্ততা দেখালেন তবু শীতাংশু স্বাভাবিক সৌজন্য ও বিনয়বশে গাড়ির দিকে এগিয়ে । সেখানে কিশোরীর সঙ্গে কথা বলে ফিরে এল। শীতাংশু ল, "খুব বেশী দেরি হবে না বলছে··· ।"

দেবীদাস এই অপেক্ষার জন্যে মোটেই বিরক্ত নন ; বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা যাও। আমি খানিকটা পায়চারি করি।"

শীতাংশুরা চলে গেল। গেট পর্যন্ত ওরা কেউ সাইকেলে চাপল না, দেবীদাস দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখে ওরা সাইকেল ঠেলে গেট পর্যন্ত গেল, ওপারে গিয়ে সাইকেলে চড়ল। দেবীদাস দেখলেন, শীতাংশু এবং শর্মা পাশাপাশি চলে যাচ্ছে। আরও কেউ কেউ চলে গেল।

অফিস ফাঁকা হয়ে এল। আশেপাশে বড় আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দুজন মালী পশ্চিমের দিকে তারের জাল দেওয়া বাগানে কয়েকটি উদ্ভিদের পরিচর্যা সেরে জলের ঝারি নিয়ে মালী-ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল। বড় দরোয়ান অফিসের দরজা জানলা বন্ধ করছে এখনও, ফাঁকা নিস্তব্ধ অফিসবাড়িতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

বিকেল পড়ে গেছে। আজকাল বেলা একটু বেড়েছে। রৌদ্রের কোনো রেখা আশেপাশে কোথাও দেখা না গেলেও আকাশে তখনও ম্লান রৌদ্রের কণা ভাসছিল। সূর্যাস্ত হয়ে আসার সময় হল। দেবীদাস সামান্যক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন। এই অফিসের সমস্তটাই এখনও নতুন, একরকম অসম্পূর্ণ বললেও বলা যায়। বাঁ-হাতি জায়গাটায় কনস্ট্রাকসানের কিছু মালমশলা পড়ে আছে আজও। থেমে থেমে ক্ষেপে ক্ষেপে কাজ এদের। দেবীদাসের ঠিক ভাল লাগে না। কিন্তু উপায় কি ? দেবীদাসের হঠাৎ মনে হল, তিনি থাকতে থাকতে এই অফিসের কাজ বোধ হয় শেষ হবে না।

কিশোরীলাল এবং ইন্দ্র গাড়ির কাজ করছিল। দেবীদাস পাশ দিয়ে যাবার সময় কিশোরীলালকে ডেকে বললেন, তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, গাড়ি ধীরে সুস্থে ঠিক করে নিক ওরা ; তিনি হেঁটেই ফিরবেন।

গেটের বাইরে এসে সামনে তাকিয়ে অদ্ভুত লাগল। শীতাংশু এবং শর্মারা যে কোথায় কতদূর চলে গেছে বোঝা গেল না, দেখা গেল না। রাস্তা একরকম ফাঁকা। পুব দিকে তারের কাঁটার বেড়া দেওয়া

অনেকটা জমি। এই জমিটা রিসার্চ সেণ্টারের; হরেক রকম গাছপালা লাগানো আছে। এখন ওই বাগানে কেউ নেই, ফটকে তালা ঝুলছে। কী রকম এক গন্ধ এল। মনে হল কাছাকাছি, বাগানে, কোথাও খানিকটা আগে ইনসেকটিসাইড্ ছড়ানো হয়েছে, বাতাসে তার গন্ধ বয়ে এল।

শীতাংশু ওই বাগানে একটা কাজ করছে। তার কাজের কতদূর কি হল দেবীদাস এখনও সঠিক ভাবে জানেন না। শীতাংশু একটা রিপোর্ট দিয়ে রেখেছে, সময় করে দেখতে হবে।

নিজের ছাত্র বলেই বোধ হয় দেবীদাস শীতাংশুর ওপর একটু বেশী ভরসা করেন। ছেলে খারাপ নয়, কাজকর্ম মন্দ করে না। যে কাজটা এখন করছে তাতে ওর মন লেগেছে। কাজটা করুক, আখের ফলন যত কম নষ্ট হয় ততই এদিককার ক্ষেতীখামারীদের পক্ষে মঙ্গল।

পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিলেন দেবীদাস। অন্যমনস্ক পায়ে হাঁটতে লাগলেন। দেখতে দেখতে চারপাশ আরও ম্লান হয়ে এল। আকাশে বোধ হয় সূর্য ডুবে গেল। দেবীদাস চোখ তুলে আকাশ দেখলেন না। দু পাশেই উঁচু নিচু মাঠ, অনুর্বর। অনেকটা দূরে কোথাও কোথাও ছোট ছোট ক্ষেতখামার আছে। এ-সময় বাতাস বইছিল আপন স্বভাবে, তার কোনো স্থিরতা বা নির্দিষ্ট গতি ছিল না।

আরও খানিকটা হেঁটে আসতে সর্বত্রই বেশ ধূসর ও ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এল। শীতাংশুর কথা মনে পড়ায় দেবীদাস কিছুক্ষণ থেকে ক্রমশই কালকের রাত্রির ঘটনা ও চিন্তার মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছিলেন। খুবই আশ্চর্যের কথা! এ-রকম ভাবে আবার দেখা হবে কে জানত! সুমিত্রাকে চিনতে তাঁর বেশ খটকা লেগেছিল। অনেক বড় হয়ে গেছে, অ-নেক। অঞ্জলি তা হলে এখন কাঁচড়াপাড়ায়। কাঁচড়াপাড়া শুনে প্রথমে দেবীদাস বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। যাক্, সে-রকম কিছু

না। অঞ্জলি সংসারী হয়েছে। তার সংসার ঠিক কেমন দেবীদাস জানেন না, তবে সে বিয়ে-থা করে সাধারণ স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে দেবীদাস তা অনুমান করতে পেরেছেন। অঞ্জলির কথা ভাবতে এখন ভালই লাগছিল।

সিগারেটের টুকরোটা এক সময় রাস্তার পাশে ফেলে দিলেন দেবীদাস। অন্ধকার হয়ে এসেছিল। এই অন্ধকার দেবীদাসের পছন্দ হচ্ছিল, একা একা হাঁটতেও তাঁর ইচ্ছে করছিল এখন। মাঠের এক রকম বিষণ্ণ গন্ধ আছে, এই সন্ধ্যাকালে সেই বিষণ্ণতা অনুভব করা যায়। এবং এই যে ছায়াচ্ছন্নতা ও অন্ধকার—সমস্ত প্রান্তরময় ছড়িয়ে রয়েছে—এই অস্পষ্টতার মধ্যে দৃষ্টি ক্রমশ অন্ধ হয়ে আসছে বলে মন আর বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল হতে পারছে না। দেবীদাস একটি নির্দিষ্ট চিন্তার আকার যেন গড়ে নিতে পারছিলেন। তিনি বিষণ্ণ কোনো রকমের এক ক্লেশ ও বেদনা বোধ করছেন।

সুমিত্রাও নিশ্চয় আশা করে নি দেবীদাসকে এখানে দেখতে পাবে কিন্তু সে প্রস্তুত ছিল। দেবীদাস প্রস্তুত ছিলেন না। সুমিত্রাকে কাল চমকে উঠতে, অবাক হতে, বা বিহ্বল হতে দেবীদাস দেখলেন না যেন সে খুব সতর্ক হয়ে হিসেব করে তার আচরণ স্থির করে এসেছিল খুব যত্নে সুমিত্রা তার ব্যবহার নিস্পৃহ করে রেখেছিল। তার আচরণে মনে করা যায় না, দেবীদাস তাদের বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

দেবীদাস অবশ্য লক্ষ করে না দেখলেও তাঁর মনে হয়েছে, সুমিত্রার আচরণ খাবার টেবিলে বেশ আড়ষ্টতা এনেছিল। শীতাংশু অনেকটা যেন বিভ্রমে পড়েছিল, রমলা সঠিক কিছু বুঝতে পারছিল না যদিও তবু তার মধ্যে কৌতূহল সঞ্চার হয়েছিল। দেবীদাস খুবই অস্বস্তি বোধ করেছেন। তিনি কখনও ভাবছিলেন, কি করে এই রকম ঘটনা ঘটল? কখনও তাঁর মনে হচ্ছিল, অপ্রত্যাশিত এই ঘটনা ঘটবে এ যেন তাঁর ভাগ্যে লেখা ছিল। এ-রকম হয়, আকস্মিকতাকে মাঝে মাঝে ভাগ্যের সঙ্গে না জড়ালে সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। দেবীদাস

খুবই অবাক হয়ে দেখলেন, শীতাংশুকে এখানে যখন চাকরি দিয়ে নিয়ে আসেন তখনও—তখনও কোথায় যেন একটা আকস্মিকতার যোগাযোগ ছিল, নয়তো নিজের কোনো পুরোনো ছাত্রকে এখানে পাবার কথা নয়। তবু, সেই যোগাযোগ এমন কিছু অবিশ্বাস্য বা কল্পনাতীত মনে হয় নি। শীতাংশুকে আনতে পেরে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। শত হলেও পরিচিত মুখ, জানাশোনা মানুষ, আত্মীয়স্বজনকে বিদেশ বিভুঁয়ে পেলে কে না খুশী হয়। কিন্তু কে জানত, কেমন করেই বা জানা সম্ভব—শীতাংশুর স্ত্রী সুমিত্রা! এবং এখানে, এত কাল পরে তাকে তিনি দেখতে পাবেন!

সুমিত্রাকে দেখে দেবীদাসের মন অন্যমনস্ক হবার কথা। যদিও সে একা, তবু তার সঙ্গে ওদের অনেকের চিন্তা মিশিয়ে আছে, এমন কি দেবীদাসের জীবনের একাংশ। সুমিত্রার আগমন ঠিক শীতাংশুর আগমনের মতন নয়, শীতাংশু যখন এসেছিল তখন অতীত থেকে একটিমাত্র পরিচিত মুখের স্মৃতি নিয়ে এসেছিল, সে স্মৃতি ছোট, আনন্দদায়ক। সুমিত্রা এসেছে অনেক কিছুকে সঙ্গে নিয়ে। তাদের গোটা পরিবার—সুমিত্রার মা, তার দিদি অঞ্জলি, সুমিত্রা নিজে, তার ছোট ভাই—এতগুলি মানুষের স্মৃতি সে এনেছে, এবং কয়েকটি বছরের। এই স্মৃতি আনন্দদায়ক নয়, বেদনাপূর্ণ। বেদনাপূর্ণ বলেই তা যে পরিত্যাজ্য তাও নয়। তবে এই বেদনাদায়ক স্মৃতির অনেকখানিই গ্লানিকর, লজ্জাকর। স্বভাবতই সঙ্কুচিত ও আড়ষ্ট হবার কারণ রয়েছে। দেবীদাস নিজেকে এই মুহূর্তে কেমন যাতনা-পীড়িত মনে করলেন। পিঠের কাছটায় ভারী মনে হল, যেন তিনি অনেকক্ষণ কিছুর ভার বয়ে নিয়ে হাঁটছেন।

দেবীদাস পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন। না, ঠিক যে ক্লান্তির জন্যে দাঁড়ালেন তা নয়, তবু কোথায় যেন সামান্য অবসন্নতার ভাব এসেছে। মরা শীতের বাতাস, অল্প ঠাণ্ডা লাগছিল। খুব হালকা ধোঁয়ার মতন একটা কুয়াশার ভাব এসেছে চারপাশে। কিছু দেখা

যাচ্ছে না কাছের, বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। সামনে থেকে কারা যেন আসছে, পায়ের শব্দ এবং গলা শোনা যাচ্ছিল।

হাঁটতে শুরু করলেন দেবীদাস, এখনও কিছুটা পথ। এই ভ্রমণ যে খারাপ লাগছে তা নয়, বরং এই ভাবে সমস্ত কিছু থেকে আড়ালে সরে এসে নিভৃতে এবং নির্জনে থাকতে ভালই লাগছে, কিন্তু তিনি বেশ বুঝতে পারছেন, কি একটা অপ্রিয় বিষয় তাঁকে মনে মনে বিরক্ত করে তুলেছে।

সামনে দিয়ে যারা আসছিল, তারা পাশ কাটিয়ে চলে গেল। দেবীদাস লক্ষ করলেন না, গ্রাম্য ছুটি মানুষ হয়তো, কথা বলতে বলতে দ্রুত পায়ে পেরিয়ে গেল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে দেবীদাসের মনে হল, সুমিত্রার সঙ্গে কাল তাঁর আরও কিছু কথাবার্তা বলা উচিত ছিল। তিনি যেন কোনো রকম আড়ষ্টতার জন্যে নিজেও স্বাভাবিক হতে পারেন নি। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু এবং খারাপ হয়েছে।

রমলা রাত্রে সুমিত্রাদের কথা জিজ্ঞেস করছিল। দেবীদাস তেমন কোনো উৎসাহ দেখান নি। যেন সুমিত্রাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ বা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু না। হ্যাঁ, তিনি সুমিত্রাদের চিনতেন, জানতেন, সুমিত্রার মা, দিদি তাঁর পরিচিত ছিল। এই পরিচয় যে একবারে সাধারণ ঠিক তেমন কোনো ধারণাও অবশ্য দেবীদাস রমলাকে করতে দেন নি, বরং দেবীদাস যা বোঝাতে চেয়েছেন তাতে রমলার মনে করা উচিত, সুমিত্রাদের পরিবারের সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় ছিল তাঁর।

দেবীদাস এখন কেন যেন যথেষ্ট অপ্রসন্ন হলেন নিজের ওপর। অপ্রসন্ন হলেন এই কারণে যে, তাঁর মনে হল তিনি অনুচিত কাজ কিছু করেছেন। সুমিত্রার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার আন্তরিক ও সহজ হলে হয়তো এত খারাপ লাগত না। রমলাকে তিনি যতটুকু বলেছেন এবং যেভাবে সুমিত্রাদের কথা বলেছেন, তার চেয়ে কিছুটা বেশী রমলাকে বললে

হয়তো সে কিছু মনে করত না। কিন্তু দেবীদাস খুবই সংক্ষিপ্ত হতে চেয়েছেন, যেটুকু না বললে রমলার কথার জবাব হয় না—মাত্র সেটুকু বলেছেন। কেন?

দেবীদাসের ধারণা হল, সুমিত্রার মতন তিনিও যেন খুব হিসেবী এবং সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন। হয়তো সুমিত্রাকে দেখার পরই কোনো রকমের এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি তাঁর মনকে সতর্ক ও সাবধানী করে দিয়েছিল। সুমিত্রা জানত, দেবীদাসকে সে দেখতে পাবে এখানে—কাজেই সে·সাবধান হয়ে উঠতে পেরেছিল; দেবীদাস জানতেন না প্রথমে, পরে জানামাত্র সতর্ক হয়ে উঠলেন।

ভাল লাগছিল না দেবীদাসের। এ-ধরনের সতর্কতা তাঁর কাছে ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠছিল। সুমিত্রা এবং তাঁর বয়েস এক নয়। সুমিত্রা যা পারে—যে সাবধানতা সে প্রয়োজনীয় মনে করে, দেবীদাস কি তাই পারেন, না তাঁর পক্ষে সুমিত্রার মতন সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে?

নিজের ওপর বিরক্ত ও অপ্রসন্ন হয়ে দেবীদাস এই অস্বস্তিকর চিন্তাটা আপাতত চাপা দেবার চেষ্টা করলেন। তিনি চারপাশে তাকিয়ে অন্ধকার দেখার চেষ্টা করলেন, আকাশে চোখ তুললেন, তারা ফুটে উঠেছে কখন। তিনি বুঝতে পারলেন না কিশোরীলালরা গাড়ির চাকা লাগিয়ে এতক্ষণে বাড়ির পথ ধরেছে কি না! নিজের বাড়ির কথাও চকিতে তাঁর মনে এল।

·অঞ্জলির কথাই আবার তিনি ভাবতে চাইলেন। কেমন আছে অঞ্জলি? ভাল? অনেক দিন হয়ে গেল, এখন তো মোটামুটি বয়েস হয়ে গেছে, কেমন দেখতে হয়েছে? ছেলেপুলে ক'টি? তার স্বামী কি করেন?

দেবীদাসের মনে হল, তিনি এ-সব প্রশ্ন গতকাল সুমিত্রাকে করতে পারতেন, করলে অসঙ্গত বা অন্যায় হত না; বরং স্বাভাবিক হত, শিষ্টাচারসম্মত ও আন্তরিক দেখাত। তিনি সুমিত্রাদের পারিবারিক

বিষয়ে অন্যান্য পাঁচটা সাধারণ কথা তুলতে পারতেন, তোলা উচিত ছিল। দেবীদাস এ-সব কিছুই করেন নি। সুমিত্রাকে যতটা নিস্পৃহ, নিরুৎসাহ ও কঠিন দেখাচ্ছিল, দেবীদাসও প্রায় ততটা অনুৎসাহ দেখিয়েছেন। তাঁর উদাসীনতা এবং মনোযোগহীনতা বোধ হয় সকলেই লক্ষ করেছে। শীতাংশু কি ভেবেছে কে জানে!

নিজের মধ্যে দেবীদাস কেমন দীনতা ও ক্ষোভ অনুভব করছিলেন। সুমিত্রার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ একটি অপরিচ্ছন্ন অস্বাভাবিক আবহাওয়া গড়ে তুলেছে। নিজের আচরণের কারণ অনুসন্ধান করলে দেবীদাস দেখছেন, সুমিত্রাকে তিনি সহজ ভাবে নিতে পারছেন না। যেন ওই মেয়েটি দেবীদাসের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর কোনো দৃশ্য, যা তাঁর দেখতে ভাল লাগে নি, পছন্দ হয় নি; তিনি অখুশী ও অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এই অসন্তোষ ও বিরক্তিই কি তবে দেবীদাস গোপন করার চেষ্টা করেছেন কাল?

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন দেবীদাস। বারান্দায় আলো জ্বলছে। রমলাকে যেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। দেবীদাস ঘন এবং ভারী নিশ্বাস ফেলে কি মনে করে একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন পথের মধ্যে, তারপর আবার হাঁটতে লাগলেন।

এতক্ষণ মনের চিন্তা যেদিকে ভাসছিল, এখন দেবীদাস কেমন সচেতন হয়ে তা অন্যমুখে ফেরাবার চেষ্টা করলেন। তাঁর এই মানসিক চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতা দেবীদাসের মনঃপূত হচ্ছিল না। তাঁর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, তিনি নাবালক বা যুবক নন, তাঁর মন সহসা ভাবাবেগে আকুল হয়ে উঠবে, অথবা বিচার বিবেচনাহীন হয়ে বিশৃঙ্খল চিন্তা-সমষ্টি সৃষ্টি করবে—এ তাঁর পছন্দ নয়। তিনি আতিশয্য প্রশ্রয় দেন না। মনকে সংযত ও সম্ভ্রমযোগ্য করে তোলার অভ্যাস তাঁর আছে।

দেবীদাস ভাবলেন, সমস্ত আকস্মিকতাকেই তিনি সহজ ভাবে গ্রহণ করবেন। জীবনে অনেক অযাচিত জিনিস এসে যায়, তিনি জানেন। মানুষ নিজের পছন্দমতন ফুলবাগান করতে পারে, বেশভূষা করতে

পারে—কিন্তু তার জীবনে যা আসে, যা ঘটে তা পছন্দ মতন ফর্দ করে আনাতে পারে না। হয়তো এটা ভাগ্য, বা অন্য কিছু। কিন্তু এ সত্য অস্বীকার করার চেষ্টা করে লাভ নেই।

সুমিত্রার সম্পর্কে কোনো ধরনের বিরক্তি বিতৃষ্ণা তিনি রাখবেন না। নিজের সম্ভ্রম ও মানসিক স্বস্তির জন্যে দেবীদাস সমস্ত ঘটনাটাই সহজ ভাবে নেবার চেষ্টা করবেন। হয়তো তার বেশী কিছু করার ক্ষমতা তাঁর নেই। মানুষ সাধারণ মনোবেদনা আরোগ্য করতে পারে, যা পারে না সে তার অন্য রকম বেদনা, তার সঙ্গে শরীর বা গ্রাহ্য মনের যোগ তেমন কিছু নেই, বা থাকলেও শরীর অথবা মন থেকে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। দেবীদাস তেমন কোনো বেদনা থেকে আরোগ্যলাভ করবেন এমন চিন্তা আপাতত তিনি করছেন না। তবে, এই চঞ্চলতা, অসংযত মানসিক আচরণগুলিকে তিনি আর প্রশ্রয় দেবেন না। কোনো কোনো গবেষণার সময় এমন অনেক সমস্যা দেবীদাসের জীবনে এসেছে যার কোন সমাধান তিনি দেখতে পান নি আপাতত। মনে হয়েছে, এ সমস্যা এত জটিল ও দুরূহ যে তার সমাধান হবে না; কিন্তু দেবীদাস সেই হতাশার মুহূর্তকে সহ্য করেছেন, বুদ্ধি ব্যয় করে, যত্ন দিয়ে, পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে ক্রমে ক্রমে একটি সমাধানের পথ খুঁজে বের করে নিয়েছেন। সম্ভবত জীবনের সমস্যাও সে ভাবে সমাধান করা যায়।

৬

যেমন করে চেয়েছিল সুমিত্রা তেমন করে পারল না ; খুঁত থেকে গেল, মনে মনে ভীষণ অতৃপ্তি থাকল—তবু সে কোনো রকমে কিছুটা মানিয়ে নিল। আগে, কলকাতা ছাড়ার সময়ও তার প্রচণ্ড সুখ ছিল, মনে অবারিত আনন্দ ; অনেক ভেবেছিল, অনেক গড়েছিল, শিশুর মত তার রোমাঞ্চ ও অধীরতা লেগে ছিল ; কিন্তু এখানে এসে সে অনেক কিছু, যা ভেবেছিল, যা চেয়েছিল দেখতে পেল না।

এই জায়গাটা যে তার খারাপ লাগছে তা ঠিক নয়। বরং স্থান হিসেবে, স্বামীর কর্মস্থান বলতে আগে যে-সব জায়গায় সে গিয়েছে, দু তিন জায়গায়, তার তুলনায় এখানের সব কিছু ভাল, সবই সুন্দর। বহরমপুর কিংবা বর্ধমানের সেই পাড়াগেঁয়ে জায়গাটাকে কেউ চমৎকার বলবে না। এখানে যেই আসুক 'বাঃ! বেশ' না বলে উপায় নেই।···খুবই ফাঁকা জায়গা ; এক এক সময় মনে হবে জনমানুষ নেই, গাড়িঘোড়া ভিড় বলে কিছু না। বাংলাদেশের মতন ভিজে ভিজে মাটি, জলো আবহাওয়া এখানের নয়। এখানের সব শুকনো—মাটি শুকনো, আকাশ শুকনো, বাতাসও শুকনো। গাছ-পাতা জংলা হয়ে নেই, খটখট করছে সর্বত্র। দেখতে দেখতে ফাল্গুন মাস অনেকখানি গড়িয়ে যাবার পরও এখন পর্যন্ত সুমিত্রা মনে করতে পারছে না—এ ধরনের বসন্তকাল সে আগে দেখেছে। কি রকমের এক বসন্তকালও যেন এখানে! চারপাশ দপদপ করছে না, ঠিকরে পড়া রঙ নেই কোথাও, বাতাস তেমন এলোমেলো করেও বয় না। অথচ এখানের আকাশ মরে নেই, সারা দিন আধোনীল হয়ে পড়ে আছে, কোনো কোনো দিন নীলের ঘনতা বেড়ে গেলে মনে হয় মাথার ওপর বুঝি সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে। তা অবশ্য নয়। দুপুরের রোদে

ওই নীল ফিকে হয়ে আসে, তখন আঁশ ওঠা-ওঠা ছেঁড়া মেঘের পুঞ্জ দেখলে মনে হবে, কে বুঝি এক তুলোর বস্তা ছিঁড়ে পেঁজা তুলো ছড়িয়ে গেছে। এক একদিন আবার ওই আকাশ খুব মোলায়েম ও গভীর দেখায়, কতক চিল উড়ছে দেখা যায়। এ-সব দেখে আকাশ মরা বলে মনে হবার কিছু নেই, কিন্তু বসন্ত বলেও মনে হয় না। বরং কখনও শীতের কথা মনে পড়ে। অথচ দিনের আবহাওয়া গরমের মতন, বেশ তাপ অনুভব করা যায়; একটু বেশী রাত হলে আবার ঠাণ্ডা, শীত শীত লাগে। এখনও গায়ে ঢাকা রাখতে হয় রাত্রে। মাঝরাতে হিমও পড়ছে, সকালে ঘাস ভিজে থাকে।

সুমিত্রার ধারণা হয়ে আসছে, ছড়ানো মেলানো, প্রখর চোখ জুড়ানো যে বসন্ত সে-রকম বসন্ত এদেশে আসে না। বিকেল পড়ছে কি সন্ধ্যে হল—আর দক্ষিণেব এলোমেলো মিষ্টি বাতাস বইতে লাগল উত্তাল হয়ে, শরীর মন জুড়িয়ে গেল, তেমন বাতাসও এখানে কই বইছে না। এখানের বসন্ত কালটা চাপা, শান্ত; যেন বয়স হয়ে যাওয়ায় গম্ভীর হয়ে গেছে, হুটোপুটি করে কিছু করছে না। তাই গাছের পাতায় সাড়া নেই তেমন, যা হবার তলায় তলায় হচ্ছে, অগোচরে। ফুলের দেখা নেই, ক্বচিৎ কদাচিৎ চেনা কোনো ফুল চোখে পড়ে। তাদের বাড়ির বাগানে—মানে সামনের জমিটুকুতে শুধু কলাফুল, কয়েকটা মরা গাঁদা, একটা কলকে ফুলের ঝোপ। এ-দেশী দু চারটে ফুলচারাও রয়েছে—তাদের কোনো শোভা নেই।... কৃপণের মতন গাছগুলো একটি দুটি করে ফুল ফোটায়, সেই ফুল মরে গেলে আবার দুটি কুঁড়ি মেলে ধরে!...কোনোদিন একটা কোকিল ডাকল না।

একদিন কি খেয়ালে সুমিত্রা শীতাংশুকে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ গো, এখানে কোকিল নেই?"

"কোকিল! কেন? কোকিল দরকার কিসের?"

"এমনি জিজ্ঞেস করছি। একদিনও ডাকতে শুনলাম না।"

"কি জানি, আমারও কানে যায় নি।" বলে শীতাংশু কি ভেবে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রগড় করে বলল, "কোকিলের দরকার কি, আমিই তো রয়েছি।"

"তুমি!" পালটা জবাব দিল সুমিত্রা, হেসে হেসেই, "তোমার ওই গলায় কোকিল হতে হয় না।"

"ইয়ার্কি মের না। আমি যে রকম গলায় তোমায় ডাকি, ডাকুক দেখি কে ডাকবে! এমন সুইট্ টোন্..."

"থাক্ থাক্; সুইট টোনের বহর তো দেখছি, কোকিল না হোক কাক বলে মনে হবে।" সুমিত্রা বলতে বলতে হেসে উঠল। তারপর দুজনের নানান খুনসুটি চলল।

আর-একদিন কি কথায় বসন্তকালের কথা উঠল। সুমিত্রা বলল, "কি তোমার জায়গা, এক ফোঁটা বসন্ত নেই—!"

"কে বলল নেই? আছে। তবে বসনে ঢাকা বসন্ত, তোমার মতন।" শীতাংশু জবাব দিল।

দু জনে ছেলেমানুষের মতন খানিক হুটোপাটি করল, তারপর শীতাংশু ভর বিকেলে সুমিত্রার চুল এলোমেলো, মুখ লালচে করে দিল; সুমিত্রা শীতাংশুর অফিসের জামার বোতাম ছিঁড়ে ফেলল, গলায় দাগ বসে গেল নখের। এই রকমই করে ওরা। বরাবর। স্বভাবে কোথাও বোধ হয় এখনও কিছুটা ছেলেমানুষী থেকে গেছে।

শেষে সুমিত্রা বলল, "দিন দিন তোমার রসিকতা বাড়ছে, তেমনি অসভ্য হয়ে উঠেছ।"

"রসের কাজ করছি কি না তাই।" শীতাংশু সিগারেট ধরিয়ে চায়ের কাপ টেনে নিল। শোবার ঘরে বসেই আজ চা খাচ্ছিল, সবে অফিস থেকে ফিরেছে। চা খেতে খেতে বলল, "আখ গাছের গোড়ায় এক রকম পোকা হয়, খুব হুঁশিয়ার পোকা, রসিক পোকা বলতে পার, রসই তাদের..."

বাধা দিল সুমিত্রা। বলল, "আমি না বলেছি তোমায়,

পোকামাকড়ের গল্প আমায় শোনাবে না। বিচ্ছিরি লাগে আমার। অফিসে সারাদিন পোকামাকড় করছ করো, বাড়িতে বাপু ও-সব ঢুকিয়ো না।"

"তুমি কি প্ল্যাণ্ট? আখ না সরষে? গম না রেড়ি?"

"জামায় চা পড়বে! কি রকম ক্যাবলার মতন ধরছ কাপটা?" সুমিত্রা ভর্ৎসনা করল, করে জিব ভেঙচে বলল, "জামায় চা পড়লে তো তখুনি হাঁক ছাড়বে—সুমি, গেল, জামাটা গেল···শীগগির জলে দাও—"

"ধ্যুত তোর, যা বলছি শোন না।"

"শুনব না।"

"আমি তোমার কানের কাছে তবে চেঁচাব।"

"চেঁচিয়ে দেখ···"

শীতাংশু হঠাৎ ভীষণ চেঁচিয়ে বলল, "গাছ-খেকো পোকা আর মানুষ-খেকো পোকা এক পদার্থ নয়···" বলেই গলার সেই তারস্বর হঠাৎ একেবারে খাদে নামিয়ে, সুমিত্রার চোখের দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করে বলল, "আর হলেই বা কি, আমার বউয়ের গোড়ায় পোকা লাগবে না, আমি প্রটেকসান দিয়ে রেখেছি।"

সুমিত্রা যেন এক ছুটে শীতাংশুর গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, জোরে চিমটি কেটে দিল। তারপর স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চগলায় বলল, "আপনি আরও কি কি করছেন তাই বা কে জানে!"

কেমন একটু হতবাক হয়ে গেল শীতাংশু। মুখ ফিরিয়ে বলল, "হোয়াট্ ডু ইউ মীন?"

"ইস্ ন্যাকামি!" সুমিত্রা মুখ সরিয়ে নিয়ে ঠোঁট বেঁকাল।

"সত্যি না, ব্যাপারটা কি?"

"ওই তো পড়ে আছে টেবিলে—দেখে নাও।" সুমিত্রা হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে টেবিল দেখাল।

"দেখবো'খন? তুমি আগে বল!"

"তোমার রমলাদি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছে। একটু বেলাবেলি—"

"কি দরকার কিছু লিখেছেন?"

"বিশেষ দরকার।"

শীতাংশু দু মুহূর্ত ভাবল, বলল, "কি জানি। মনে করতে পারছি না। কাল অনেকক্ষণ ছিলাম ওবাড়িতে, কই কিছু বলেন নি!"

"বললেও কি তোমার মনে আছে আর?" সুমিত্রা চাপা হাসি হেসে বলল।

"আমার স্মৃতিশক্তি তোমার মতন নয়…"

"স্মৃতির কথা কে বলছে। সামনে রমলাদি থাকলে তোমার মুখের যা অবস্থা হয়…যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোপ পেয়েছে…"

"তাই নাকি! এরপর একদিন তুমি ওই অবস্থায় রমলাদির ঘাড়ের দিক থেকে একটা আয়না ধরে আমায় মুখ দেখিয়ো তো, লোপ পাওয়া অবস্থাটা দেখব একবার।"

সুমিত্রা জবাব দিতে পারল না।

শীতাংশু স্ত্রীকে জব্দ হতে দেখে এবার প্রবল জোরে হেসে উঠল। সুমিত্রাও হেসে ফেলল।

পরে সুমিত্রা বলল, "একটা সত্যি কথা বলব?"

"যা বাব্‌বা. তুমি কি মিথ্যে কথা বলো কোনো কালে?"

কথাটা এমন কি, তবু কেমন বিচলিত হল সুমিত্রা; সামান্য আগে পোকা লাগার কথাতেও হয়েছিল। এই ধরনের কথাগুলো কেমন যেন আজকাল খচ্‌ করে কানে লাগে, মনে টোকা দিয়ে যায়, মনে হয় কে যেন সুমিত্রাকে জব্দ করবার জন্যে সদরে কড়া নেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

"কই, কি হল? সত্যি কথাটা বলো?" শীতাংশু বলল।

"বলছি—", সুমিত্রা সামলে নিল নিজেকে; বলল, "এখন ভাবি

এ-জায়গায় না এলেই ভাল হত।" কথাটা সুমিত্রা যথাসাধ্য সাধারণ করে হালকা স্বরেই বলার চেষ্টা করল, যেন স্বামীর সঙ্গে পরিহাস করছে।

শীতাংশু স্ত্রীর দিকে চোখ তুলল। "মনে ভয় ঢুকেছে বুঝি?" রঙ্গ করেই বলল শীতাংশু, চোখমুখের নাটকীয় ভঙ্গি করে।

"ভাবনা।" সুমিত্রা নকল দুশ্চিন্তার মুখ করল, "ভাবনা হচ্ছে।"

"ঈর্ষা?"

"তাও হচ্ছে", সুমিত্রা এবার হাসার মতন করে বলল, বলে স্বামীর পিছনে সরে গেল, ঘাড়ের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াল। একটু চুপ করে থেকে, সামান্য নুয়ে শীতাংশুর মাথায় চিবুক ছুঁইয়ে বলল আবার, "এখানে অমন একজন সুন্দরী মেয়ে আছে জানলে কে আসত! ভয় বাপু সকলেরই হয়।"

সুমিত্রার মুখ দেখা যাচ্ছিল না বলে এবং তার গলার স্বর লঘু বলে শীতাংশু সব কিছুই অর্থহীন রঙ্গরসিকতা বলেই ভাবছিল। বলল, "মেয়েরা ও-রকম একটু হয়, সাসপিসাস নেচারের, জেলাস···।"

"ছেলেরা?"

"গঙ্গাজল।···আমাদের ও-সব পেটি ব্যাপারে চোখ নেই।"

"থাক্, বলো না। পুরুষে কত গঙ্গাজল তা আমার জানা আছে—তাদের···"

"তোমার জানা আছে?" শীতাংশু কথার মাঝখানে হুট্ করে শুধলো, অবশ্য মজা করেই।

সুমিত্রা কেমন থতমত খেয়ে গেল, বিব্রত বোধ করল। শীতাংশু তাকে দেখতে পাচ্ছে না, নয়তো বিচ্ছিরি এক অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হত। তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিয়ে সুমিত্রা বলল, "তা আমার না-জানার কি আছে। তোমাকে নিয়েই দেখছি। তিন বছর বিয়ে, অথচ ছ বছর ধরে তুমি আমায় জ্বালিয়েছ। কত গঙ্গাজল পুরুষ!

মশাইয়ের জন্যে আমায় চাকরি ছেড়ে দিতে হল। ছি ছি···" সুমিত্রা আদর করে স্বামীর চুল টেনে দিল, মাথায় গাল ছুঁইয়ে রাখল।

শীতাংশু ডান হাত তুলে পিঠের দিকে ফেরাল, সুমিত্রার কাঁধ স্পর্শ করতে পারল, ঈষৎ চাপ দিল হাতের; বলল, "আমাদের মতন ভালবাসা ক'জনের হয়!···কি রকম গভীর প্রেম!" শীতাংশু হাসল।

সুমিত্রা সুখের মধ্যেই বলল, "এই ভালবাসায় আমি কাউকে ভাগ বসাতে দিচ্ছি না, বুঝলে?"

"তেমন উৎসাহ কারুর নেই।"

"উৎসাহ না থাক চোখ-টাটানি থাকতে পারে।"

"তোমার মস্তিষ্কটি খারাপ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।"

"হোক খারাপ। তুমি ও-বাড়ি যাওয়া-আসা একটু কমাও।··· কি দরকার? চাকরি চাকরি, তা বলে তোমার মাস্টারমশা'য়ের অত বাধ্য হবার কিছু নেই, লোকে তোমায় খোসামুদে ভাববে, ভাববে চালাক, স্বার্থপর।"

শীতাংশু সামান্য অখুশী গলায় বলল, "আমায় ও-সব ভাববার কোনো কারণ নেই। দেবীদাসবাবুর সঙ্গে বাড়িতে আমার কথাবার্তাই হয় না বেশীর ভাগ দিন। যখন হয় তখনও সেটা আনঅফিসিয়াল।"

"লোকে কি তাই দেখছে, না শুনছে?"

"এখানে লোকটা কে? আট দশজন মানুষ আমরা, আর কুলিকাবারী—"

সুমিত্রা আর তর্ক করল না। সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, "অত জানি না। আমার যা ভাল লাগে না বললাম। তারপর তোমার মর্জি—"

শীতাংশু বলতে যাচ্ছিল, দেবীদাসবাবুকে তোমার ভাল লাগে না তুমি না হয় বলেছ, কিন্তু তোমার ভাল লাগে না বলেই ওঁর সঙ্গে আমার ভাল সম্পর্কটা নষ্ট করতে হবে। রমলাদির ওপরও তোমার

তেমন সুনজর নেই। কেন যে, আমি বুঝি না। উনি আমার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখতে চান, শুধু এই জন্যে তোমার মনে এরকম একটা অকারণ অখুশী ভাব কেন থাকবে? রমলাদিকে আমার ভাল লাগে। ভাল লাগার মত মানুষ তিনি।

ততক্ষণে সুমিত্রা আর সামনে ছিল না; চায়ের কাপ, সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেছে। বাইরে মোহন যেন কাঠ কাটছিল, কাঠ কাটার শব্দ আসছে। সুমিত্রাকে আবার ডাকবে, কিছু বলবে তেমন উৎসাহ পেল না শীতাংশু। এ এক ধরনের পাগলামি ছাড়া কিছু নয়ঃ কবে কোন যুগে কে কি করেছে তাই নিয়ে অশান্তি পাওয়ার কোনো মানে হয় না। 'তুমি পাগল—' শীতাংশু স্ত্রীকে কয়েকবারই বুঝিয়ে বলেছে, 'অত পুরোনো কথা কে কবে মনে রাখে! ভুলে যাও ও-সব, ভুলে যাওয়াই ভাল।' অবশ্য স্ত্রীর সামনে শীতাংশু পুরোনো কথা শুনে দেবীদাসবাবুর অন্যায়টা স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু মনে মনে তার আপত্তি আছে। আপত্তিটা এই যে, দেবীদাসবাবুর তরফেও তো কিছু বলার আছে যা সুমিত্রারা জানে না। ওঁর দিকের কথাও কি বিবেচনা করা উচিত না?...তাছাড়া, অন্যায় যা সেটা দেবীদাসবাবু সুমিত্রার কাছে করেন নি, অঞ্জলির কাছে করেছেন। 'তোমার দিদির সঙ্গে কি হয়েছে তা নিয়ে তোমার এমন পাগলামি করার কি আছে?'

একবার ওই কথাটা বলতে গিয়ে শীতাংশু বিপদে পড়েছিল। সুমিত্রা যেন দপ করে জ্বলে গেল রাগে। অত্যন্ত অসহিষ্ণু, বিরক্ত ও তিক্ত হয়ে বলেছিল, "তার মানে? দিদির সঙ্গে যে লোকটা ধূর্তমি করেছে, দিদির সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল, তাকে কি আমরা ধূপধুনো দিয়ে পুজো করব বাড়িসুদ্ধ লোক!...তুমি আজ তোমার মাস্টার-মশাইয়ের গুণপনায় গলে যাচ্ছ, কিন্তু যদি ওই দেবীদাস লোকটা তোমার দিদি বা বোনের সর্বনাশ করতে যেত—তুমি বুঝি মুখ বুজে থাকতে! আমাদের পরিবারকে কিভাবে লজ্জায় ফেলে ও

পালিয়েছিল তা জান? টিটকিরিতে আমরা মুখ দেখাতে পারতাম না।"

ঘটনাটার ওপর সুমিত্রা যত জোর দেয়, তেমন জোর দেবার সত্যিই কিছু আছে কি না শীতাংশুর তাতে সন্দেহ হয়। এ-রকম ঘটনা নতুন নয়, হামেশাই ঘটে থাকে। স্ত্রীর মুখ থেকে যা শুনেছে শীতাংশু এখন আরও একবার ওর মনে পড়ল।

সুমিত্রারা তখন কলকাতায় বিপ্রদাস স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে থাকত—মা, ওরা দু-বোন ও নাবালক ছোট ভাই। বাবা অল্প কিছুদিন হল মারা গেছেন। শৌখিন, খরুচে মানুষের হাতে পড়লে সংসারের যে অবস্থা হয়, বাবার হাতে পড়ে সুমিত্রাদের সংসারের সেই রকম অবস্থা হয়েছিল, টাকা আসত আর গলে যেত; খেয়ে পরে, বেশবাসে, নানারকম বিদঘুটে শৌখিনতায় উপার্জন নিঃশেষ হত; এমন কিছু থাকত না যাকে সঞ্চয় বলে। বাবা মারা যাবার পর ইনসিওরেন্সের টাকা আর চাকরির জমানো পুঁজিই হল সম্বল। বাবা বেঁচে থাকতে যে রীতিতে সংসারটা চলত, তার ধরন পালটানো মুশকিল ছিল। গরীবিভাবে কিংবা কায়কষ্টে সংসার চালালে হয়তো দিদিকে চাকরি করতে না পাঠিয়েও এম-এ-টা পড়ানো যেত। কিন্তু তা পারা গেল না, হু হু করে হাতের টাকা খরচ হয়ে আসতে লাগল, তারপর দেখা গেল বাবা চলে গিয়ে সংসারে একটা মস্ত গর্ত হয়ে গেছে। দিদি—মানে অঞ্জুদি, এম-এ পড়তে ঢোকার আগে এক চাকরি জুটিয়ে নিল, কর্পোরেশান স্কুলের মাস্টারী। নামে মাত্র চাকরি, মাসান্তে মাইনে আনা। দিদির চোখ এম-এ পড়ার দিকে। মা এবং দিদি দুজনেই স্বপ্ন দেখত, এম-এটা পাশ করা হয়ে গেলে দিদি মালতীমাসির কলেজে চাকরি নিয়ে মফস্বলে চলে যাবে। সংসারটা মফস্বলে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারলে অনেক সুবিধে। দেবীদাস এ-সময় থেকেই সুমিত্রাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করেছেন, দিদির সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মেলামেশা। সুমিত্রার বয়স তখন যদিও বছর ষোলো, স্কুলের

শেষ ক্লাসে, তবু তাদের সংসারের আবহাওয়ার খোলামেলা চালচলন থেকে সে অনেক কিছু জানতে শিখেছিল। তার চেয়ে বছর পাঁচ-ছয়ের বড় দিদি যে দেবীদাসের প্রেমে পড়েছে এই সাদা কথাটা সে জানত, বুঝতে পারত। না জানার কিছু ছিল না, কেননা বাড়িতে সবই তাদের খোলাখুলি ছিল ; মাও জানত। মা বলত ঃ দেবীদাস হীরের টুকরো ছেলে, ওই বয়সেই কাগজে তাঁর ছবি বেরিয়ে গেছে। দিদির চোখে দেবীদাস 'জিনিআস'। কথাটা দিদি দিনে কতবার করে যে বলত, যেন ভূ-ভারতে এ-রকম রত্ন আর জন্মায় নি। রাত্রে দিদিব সঙ্গে খাটে শুয়ে সুমিত্রাকে প্রায়ই জিনিয়াস-এর টুকরো-টাকরা গল্প শুনতে হত। দিদি যেটুকু বলায় সুখ পেত, বলত। বালিশ বুকের তলায় দিয়ে টেবল-ল্যাম্প জ্বেলে দিদি এম-এ ক্লাসের পড়ার বই খুলে রাখত, পড়ত বলে মনে হয় না, কেননা সুমিত্রা পাশে শুয়ে আকাশমুখো হয়ে থাকলেও দিদির মুখ বুঝতে পারত, বুঝতে পারত দিদি হয় জিনিয়াস-এর মুখ ভাবছে, না হয় সেদিন যা যা ঘটেছে, তার স্মৃতি নিয়ে তন্ময়। দিদি কখনও আপনমনে হেসে উঠত, কখনও অস্পষ্ট করে নিজের মনে আব্দারের সুরে কিছু বলত ; সুমিত্রা আবছা তন্দ্রার মধ্যে বুঝতে পারত দিদি কার এবং কিসের কথা বলছে।...দেবীদাসের সঙ্গে যে অঞ্জুদির বিয়ে হবে এটা যেন ঠিক হয়ে গিয়েছিল, মুখে ও-ধরনের কথা সরাসরি কেউ পাড়ত না, কিন্তু দিদির কথাবার্তা থেকে এবং কখনও কখনও মা'র দু-একটা কথা থেকে বোঝা যেত, বিয়ের ব্যাপারটা স্থির হয়েই আছে। এমন কি দিদি এক একদিন সুমিত্রাকে বলত, 'আমরা এ-দেশেই থাকব না, বুঝলি। এ ছাই দেশের প্রফেসারদের কিবা মাইনে, কতটুকু সুযোগ-সুবিধে! চলে যাব।' কখনও বা ঠাট্টা করে বলত, 'তোর দেবীদা তোর মুখের কী প্রশংসাই করে। তোকে খুব ভালবাসে রে, সুমি! দেখিস বাবা বেশী সাজিসগুজিস না।'...সাজগোজ ছিল দিদির। বাড়ির বড় বলে বাবার প্রশ্রয় ও যেমন সবার আগে থাকতে পেয়েছে, তেমনি সবার বেশীও পেয়েছিল। তা দিদি সুন্দরী ছিল,

আহামরি যদি না বলো, না বললে, তবে সুন্দরী নিশ্চয়। সাজগোজ করতে তার ভাল লাগত, সে সাজত। সংসারের যখন অবস্থা খারাপ তখনও দিদি খারাপ শাড়ি জামা, এতটুকু ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরে বাইরে যেত না। অবশ্য দিদির সাজগোজ কখনও চোখে লাগার মতন ছিল না। বাবার শৌখিনতার ধাত পেয়েছিল সে, যাকে ঠিক বিলাসিতা বলে তা নয়, ফিটফাট ছিমছাম থাকার স্বভাব।

সবই ভালয় ভালয় কাটছিল, কোথাও কোনো গোলমাল দেখা দেয় নি। হঠাৎ যেন যা হবার নয় তাই হয়ে গেল। সুমিত্রা সেবারে কলেজে ঢুকেছে। দিদির এম-এ পরীক্ষার বছর, পরীক্ষার মুখে মুখে আচমকা অসুখে পড়ল দিদি। দু-দিনের ভোগ নয়, বড় রকমের অসুখই, বিছানায় পড়ে থাকল টানা চার-মাস। অসুখ সারতে আরও কিছুটা সময় লাগল, পরীক্ষাটাও দেওয়া হল না। কিন্তু এ-সব তেমন বড় কথা নয়; বড় কথা অসুখের মধ্যেই দিদি কেমন বদলে গেল, দেবীদাসও অন্য মানুষ। দেবীদাস যে কি ভেবেছিলেন দিদিকে, কে জানে! তবে মা'র গলার চাপা স্বরের কথা থেকে বোঝা যেত, নেহাৎ যেন কপালগুণে ভগবানের দয়ায় দিদি সে যাত্রা বেঁচে গেছে। দেবীদাসকে মা কত করে বলেছে তখন দিদিকে বিয়ে করতে, হাতে ধরে সেধেছে। দেবীদাস বিয়ে করেন নি। এ-বাড়ি আসা-যাওয়াই তিনি বন্ধ করে দিলেন।...পাড়ার পাঁচজনে ততদিনে এমন সব কথা রটিয়েছে, নিন্দে ছড়িয়েছে যে, সে-সব কথা শুনলে কানে আঙুল দিতে হবে। লজ্জায় সুমিত্রারা মুখ হেঁট করে পথ চলত। শেষে বিপ্রদাস স্ট্রীটের বাসা ছেড়ে উঠে গেল তারা কসবা। কসবায় গিয়ে নিশ্বাস ফেলতে পারল।

"এই তো তোমার মাস্টারমশাইয়ের চরিত্র!...তুমি আবার ওকে বলো দেবতুল্য মানুষ।...আমি ওকে চামার বলে মনে করি। শয়তান—!" সুমিত্রা রাগে ক্ষোভে ঘৃণায় অত্যন্ত তিক্তস্বরে বলেছিল শেষ পর্যন্ত।

শীতাংশু আশা করে নি দেবীদাসকে ঠিক এ-ভাবে জানতে হবে। স্বভাবতই সে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, অপ্রসন্ন বোধ করেছিল। কিন্তু পরে, যখন আর মনে তেমন উত্তেজনা নেই, তখন অবশ্য সে দেবীদাসের তরফে খুব বড় রকম অন্যায় খুঁজে পায় নি। অঞ্জুদির সঙ্গে যথেষ্ট মেলামেশা করেও শেষ পর্যন্ত দেবীদাস অঞ্জুদিকে বিয়ে করেন নি, এই যা অপরাধ তাঁর। অপরাধটা কী এমনই গুরুতর যে, সুমিত্রা তা ভুলতে পারছে না। ভালবাসার ব্যাপারে এ-ধরনের বিচ্ছেদ অসংখ্য মানুষের জীবনেই ঘটে থাকে। তাই কি নয়? হয়তো শেষপর্যন্ত মনের বনিবনা হয় নি, হয়তো দেবীদাস কোনো কারণে তখন বিয়ে করতে প্রস্তুত ছিলেন না, হয়তো অঞ্জুদির এমন কোনো অসুখ করেছিল যা সন্দেহজনক। হ্যাঁ, এই একটা জায়গায় কেমন খুঁতখুঁতুনি থেকে যাচ্ছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

সুমিত্রাকে জিজ্ঞেস করেছিল শীতাংশু, "অঞ্জুদির কিসের অসুখ হয়েছিল?"

"আমি ঠিক জানি না।···এক একবার এক এক রকম শুনতাম।··· তা সে যেমন অসুখই হোক, তোমার মাস্টারমশাই তার জন্যে দিদিকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে কেন?···মেয়ে হলে বুঝতে পারতে জীবনের একটা পোড়া দাগ শুকোতে কতদিন লাগে! তাও সব সময় শুকোয় না।"

সুমিত্রা এখানে কিছু গোপন করে যাচ্ছে বলে শীতাংশুর মনে হল। অথচ সে বুঝতে পারল না তার দরকার কি ছিল? সুমিত্রা যখন এত বলতে পারল, তখন কি আসে যায় অসুখের কথাটা বলতে! হয়তো নিজের দিদির সম্পর্কে আর কিছু সে বলতে চায় না। যদি এমন কিছু না হয়, যা সত্যি সত্যিই অঞ্জুদির শারীরিক শুচিতা নষ্ট করেছে, তবে অসুখটাকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে কিছু লাভ নেই, এবং দেবীদাসকে ঘৃণা করারও কিছু না। খুব সম্ভব, সে-রকম কিছু ঘটে নি। দেবীদাসকে অতটা নীচুতে নামাতে শীতাংশু রাজী না। বরং সে

অঞ্জুদিকে যতটা চেনে এবং দেখেছে, তাতে তার মনে হয় না, স্বভাবের দিক থেকে অঞ্জুদি দেবীদাসের যোগ্য। অঞ্জুদির বয়স এখন কিছু কম হল না, বছর ছত্রিশ। বিয়ে-থা করেছেন কবে, ছুটি ছেলেমেয়ে, স্বামী মোটামুটি একটা চাকরি করেন, অঞ্জুদিও স্কুলে পড়ান, তবু এখনও তাঁর স্বভাবে যেন বয়েস আসে নি। গাম্ভীর্য নেই, গভীরতা নেই। উনি এখনও হা-হা করছেন, এখনও কেমন একটা চাপল্য রয়েছে, মুখ বড় আলগা, ছেলেমেয়েদের দিকে তেমন নজর নেই, শাসনও নেই। ওঁর স্বামীকে অঞ্জুদির পাশে খুব ম্লান এবং নিরীহ দেখায়। বিজনদা খুবই ভদ্রলোক, শান্ত মানুষ। মনে হয় না, স্ত্রীকে কোনোদিনই তিনি রাশ টেনে ধরে রাখতে চেয়েছেন।···বলা অবশ্য উচিত নয়, কিন্তু শীতাংশুর ধারণা, অঞ্জুদি একটু পুরুষ-মুখো মেয়ে। পুরুষমানুষের সান্নিধ্য তাঁর বেশী ভাল লাগে। এ-সব কথা যে সুমিত্রা না জানে তা নয়, দিদির অনেক কিছুই তার পছন্দ নয়, দিদির বিষয়ে গল্প উঠলে সে বলে, বয়স হয়ে গেল তবু দিদির যেন কাণ্ডজ্ঞান হল না। অথচ এও ঠিক, দিদিকে ভীষণ ভালবাসে সুমিত্রা। দিদি একদিন যথেষ্ট করেছিল বলেই তারা ছুই ভাইবোনে মানুষ হতে পেরেছে, নয়তো কি যে হত কে জানে।

শীতাংশুর ধারণা, অঞ্জুদি মানুষ হিসেবে ভালই। ভাইবোনের ওপর অগাধ স্নেহ তাঁর, মন বোধ হয় খোলামেলা ধরনেরই—কিন্তু তাঁর চরিত্রের মধ্যে যে হালকা ভাবটা রয়েছে, এবং কোথাও একটা এলো-মেলো ধরনের মন, অস্থির কোনো ইচ্ছা যার জন্যে ওঁর চরিত্র দৃঢ়তা ও স্থৈর্য পায় নি। দেবীদাসবাবুর চরিত্রের সঙ্গে অঞ্জুদির স্বভাবের এতটা অমিল দেখে সন্দেহ হয়, দেবীদাসবাবু বোধহয় শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন, এই বিয়ে সুখের হবে না। হয়তো তিনি যা প্রত্যাশা করেছিলেন অঞ্জুদির কাছে, সেই প্রত্যাশা মেটবার নয় দেখে এবং নিজের চরিত্রের সঙ্গে কোথাও মিলছে না দেখে তিনি সরে এসেছিলেন। জেনে শুনে বুঝে যদি কেউ অশান্তির মধ্যে পড়তে না

চায়, তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। দেবীদাসের দোষ কোথায় শীতাংশু বুঝতে পারল না।

পরিষ্কার করে একটা কিছু বোঝা গেলে ভালই হত। আপাতত তা যাচ্ছে না। সুমিত্রা যদি এই ব্যাপারে পাগলামি কিছুটা কম করত! বাস্তবিক পক্ষে শীতাংশু বেশ বুঝতে পারছে, রমলাদির কাছে এই অশোভন বিষয়টা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। উনি বুঝতে পারছেন, সুমিত্রা ওঁদের পছন্দ করছে না। খুব একটা ঠাট্টার গলায় সেদিনও রমলাদি বলছিলেন, "সুমিত্রাকে বলবেন, আমি অনেকবার ওর কাছে গিয়েছি ; এবার যদি ও না আসে আমি আর যাব না।"

বাইরে শর্মার গলা পেল শীতাংশু। বিকেল যায় যায়। তাড়াতাড়ি উঠে শীতাংশু রমলার চিঠিটা মুঠোয় পুরে বাইরে শর্মার সঙ্গে কথা বলতে চলে গেল।

৭

রাত্রে বিছানায় শুয়ে দেবীদাস কাগজ দেখছিলেন। ঘুমোবার আগে এই সময়টাতেই তিনি কাগজ দেখেন। এখানে কাগজ পেতে তাঁর বিকেল বা সন্ধ্যে হয়ে যায়। দেবীদাসের অফিসের খাস পিয়ন বিকেলে যখন স্টেশনে ডাক ফেলতে যায় স্টেশনমাস্টারের ঘর থেকে কাগজটা নিয়ে আসে। পাটনার কাগজ, আসে দুপুরের গাড়িতে। স্টেশনমাস্টারের কেয়ার অফ-এ আসছে বরাবর বলে দেবীদাসও আর গা করে অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন নি।

কাগজটা দুমড়ে, খাটের মাথায় বালিশ রেখে যে ভাবে শুয়ে শুয়ে দেবীদাস কাগজ দেখেন তাতে মনে হয়, ঘুমোবার আগে এই অবসর সময়টুকুতে তিনি মোটামুটি একবার কাগজের পাতায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন।

রমলা কাছাকাছি বসে ছিল। দেবীদাসের প্রায় মুখোমুখি বেতের এক বাহারী হেলানো চেয়ারে গদির মধ্যে ডুবে বসে রমলা আলস্যভরে একটা মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। সামান্য আগেও এ-ঘরে রেডিয়ো বেজেছে, এখন নীরব, স্বরোদ বাজানো শেষ হয়ে গেলে রমলা রেডিয়ো বন্ধ করে দিয়েছে।

দেবীদাস দোমড়ানো কাগজটার পাতা পালটে নেবার সময় শব্দ হল, কাগজের শব্দ, রমলা হাই তুলল, ক্লান্তির শব্দ হল। তারপর আবার চুপচাপ।

সামান্য পরে রমলাই কথা বলল। হাতের কাগজ কোলে রেখে রমলা বলল, "কি ঠিক করলে ?"

"কিসের ?"

"ইন্দ্রর ?"

"আবার এসেছিল ?"

"রোজই আসে।...বেচারী মুখ শুকিয়ে বসে আছে।"

দেবীদাস কোনো জবাব দিলেন না। কাগজ দেখতে লাগলেন আগের মতনই। রমলা অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্প পরে দেবীদাস বললেন, "তুমি ওকে টাকা পয়সা দিচ্ছ নাকি।"

"না, না। কেন ?"

"নেশা করার টাকা পাচ্ছে কোথায় ?"

রমলা প্রথমটায় অবাক হয়েছিল, পরে বুঝতে পারল। অনুচ্চ হাসির গলা করে বলল, "এখন আর ওসব করবে না। আমার কাছে কিরায়া কেটেছে, বলেছে আর বেচাল কিছু করবে না কখনও।"

দেবীদাস এবার হাতের কাগজ সরালেন, তাঁর মুখ দেখা গেল। স্ত্রীকে লক্ষ করলেন দেবীদাস। বললেন, "ইন্দ্রের হয়ে তুমি জামিন দাঁড়াচ্ছ ?"

রমলা স্বামীর গলার স্বর শুনে বুঝতে পারল বরফ গলে গেছে, নয়তো একটু যেন ঠাট্টার মতন করে দেবীদাস কখনোই ও-কথা বলতেন না। সাহস এবং প্রশ্রয় পেয়ে রমলা হাসিমুখ করে বলল, "বেশ, জামিন দাঁড়ালাম।"

দেবীদাস দু মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তাহলে ইন্দ্রকে কাল গাড়ি নিতে বলব।...তবে রিপেয়ারিঙ কস্ট তোমাকেই দিতে হবে আর কি!" বলে দেবীদাস কাগজটা পাশে রেখে আবার বললেন, "ইন্দ্রর দশ টাকা জরিমানা হবে। টাকাটা ওই দিক বা তুমিই দাও—"

রমলা আর কিছু বলল না। মনে মনে হাসল। ইন্দ্রর কপাল ভাল, অল্পর ওপর দিয়ে গেল। কাণ্ড যা করেছিল তাতে রমলার মনে হয় নি, দেবীদাস তাকে আর চাকরিতে রাখবেন। মদ খেয়ে নেশায় চুর হয়ে গাড়ি নিয়ে আসছিল স্টেশন থেকে, সঙ্গে অফিসের অনেক

দরকারী মালপত্র, কোথায় যেন ধাক্কা লাগিয়ে এক কেলেংকারী করেছিল। রক্ষে, নিজে কোনো চোট পায় নি, অফিসের মালপত্রও তেমন কিছু ভাঙেচোরে নি। দেবীদাস প্রথমটায় যা রেগে গিয়েছিলেন, মনে হয়েছিল ইন্দ্রর চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, ওকে আর রাখবেন না দেবীদাস। গত আট-দশ দিনেরও বেশী, রমলা ক্রমাগত স্বামীর মেজাজ মর্জি বুঝে ইন্দ্রর হয়ে ওকালতি করছে। উপায় কি! বেচারী ইন্দ্র রোজ একবার করে এসে রমলার হাতে পায়ে ধরছে। সাহেব যতক্ষণ বাড়িতে আছেন, কিছুতেই আসবে না।

ব্যাপারটা মিটে গেছে দেখে রমলা খুশী হল। ইন্দ্রটা একটু পাগলাটে গোছের, বয়সও হয়েছে। কিশোরীলালের কাছে রমলা শুনেছে, ইন্দ্র এক সময় মিলিটারীতে গাড়ি চালাত। তা হতে পারে, লোকটা সত্যিই ভাল গাড়ি চালায়।

দেবীদাস আর কাগজ দেখলেন না। বাঁ পাশ থেকে সিগারেটের কেস খুলে একটা সিগারেট বের করে লাইটার দিয়ে ধরালেন। তাঁর বিছানার পাশে জানলা, বেশ বড় জানলা, বাতাস আসার জন্যে পরদা গুটোনো রয়েছে।

রমলা বুঝতে পারল, এবার শোবার সময় হয়ে গেছে। সিগারেটটা হয়তো শেষ পর্যন্ত খাবেন না দেবীদাস, জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দেবেন একসময়, তারপর জল চাইবেন, জল খাওয়া হলে শুয়ে পড়বেন।

অগত্যা রমলা উঠল। আজ এখনও বেশ গরম। পাখাটা খুলে দিতে পারলে ভাল হত। দেবীদাস এ-সময় পাখা খুলতে দিতে চান না। তাঁর একটু ঠাণ্ডার ভয় আছে। গত বছর একনাগাড়ে ভুগেছিলেন ব্রংকাইটিসে। ঠাণ্ডা-গরম জিনিসটা এড়িয়ে চলেন যতদূর সম্ভব।

কাচের গ্লাসে জল এনে বিছানার পাশে জানলার কাছে দাঁড়াল রমলা। "আজ একটু যেন বেশী গরম লাগছে।"

"গরম পড়তে শুরু করেছে !···আমাদের বাংলা দেশে এখন চৈত্র মাস।"

"বাংলা দেশের কথা তুমি এখনও ভাব?" রমলা ঠাট্টা করেই বলল।

"মনে পড়ে।" দেবীদাস কেমন অন্যমনস্ক গলায় জবাব দিলেন।

রমলা সামান্য সময় কথা বলল না। জানলার বাইরে ঝাপসা জ্যোৎস্না; হয়তো চাঁদের তলায় কোনো বড় মেঘ এসে জুটেছে। ঠিক জানলা বরাবর মাটিতে হাস্নাহানার গাছ, এখনও ফুল ফোটে নি।

"বাংলা দেশেই চলো না একবার, বেড়িয়ে আসি।" রমলা বলল, যেন স্বামীকে সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছে।

"যাব। বোলপুরে আমার এক বন্ধু আছেন। আজকাল সন্ন্যাসী মানুষ হয়ে গেছেন শুনি। তাঁর ওখানেই যাব।···হাতের সিগারেট জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দেবীদাস। রমলার কেন যেন হাসির মতন ঠোঁটের পাশ একটু কুঞ্চিত হল। বোলপুরের বন্ধু সন্ন্যাসী বলেই ওঁর বোলপুরে যাবার ইচ্ছে। মনের মিল খুঁজে যাওয়া নাকি?

"পুজোর সময় যাবার ইচ্ছে। অনেকদিন বাংলা দেশের পুজো দেখি নি।" দেবীদাস হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাস নিলেন। তাঁর বলার ভঙ্গিতে কেমন যেন এক উদাসীনতা, বিষণ্ণতা ছিল; জল খেয়ে দেবীদাস মৃদু গলায় বললেন, "তোমার যদি পছন্দ হয়, বোলপুরে সামান্য জমি কিনে রাখব। পরে একটা কুঁড়ে ঘর-টর করে থাকা যাবে।" দেবীদাস হাসার চেষ্টা করলেন শেষদিকের কথায়।

রমলা তখন কিছু বলল না। কাচের গ্লাস নিয়ে রেখে দিল, বাতি নেবাল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেলে তার বরাবরই দু দণ্ড সময় লাগে চোখ সইয়ে নিতে। কেন লাগে সে জানে না। অভ্যস্ত ঘর, আসবাবপত্র—তবু মনে হয় সে কোনো কিছু ঠাওর করতে পারছে না। চোখ সয়ে এলে পাঁচ সাত পা হেঁটে এসে বিছানায় বসল রমলা,

জানলার দিকে মুখ করে। বাইরে তখনও মেঘে-ঢাকা-পড়া জ্যোৎস্না।

"আমার পছন্দ নিয়ে কি হবে—, তোমার যদি ভাল লাগে কিনে নিও।" রমলা বলল।

দেবীদাস শুয়ে পড়েছিলেন, বললেন, "তোমার পছন্দ নিয়ে কি হবে কেন, তুমি পছন্দ করলেই হবে।"

রমলা অনুভব করতে পারল দেবীদাস কি বলতে চান। স্ত্রীর ভবিষ্যতের চিন্তা করছেন দেবীদাস। আজকাল মাঝে মাঝেই তাঁর যেন মনে পড়ে যায়—জীবনের শেষ বেলায় হেলে পড়েছেন তিনি, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের কথাগুলো তখন বোধ হয় মনে আসে।

"আমার জন্যে তোমার আজকাল খুব যেন দুশ্চিন্তা!" রমলা নিশ্বাস ফেলল দীর্ঘ করে। ভাবল, তার জীবনে এ যেন এক পরিহাস।

দেবীদাস কোনো জবাব দিলেন না অনেকক্ষণ, তারপর বললেন, "তোমার জন্যে কিছু করে যাওয়া আমার উচিত।...বয়স মানুষের বেড়েই যায়, আমার বেলায় কি আর কমবে!...কই, শোও।"

রমলা বিছানায় পা তুলে নিল, শুলো না। বাইরে যে কত বড় মেঘ রয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, আলো একটু উজ্জ্বল হয়ে আসতে আসতে আবার ঝাপসা, ম্লান হয়ে আসছে।

"আমার চাকরি আর দু চার বছর—" দেবীদাস বললেন। স্বভাবতই তিনি এ-সব কথা বলেন না, কিন্তু এখন বললেন। রমলা চুপ করে থাকল। দেবীদাস আরও পরিষ্কার করলেন কথাটা, "এক সময়ে কাজ করে সুখ পেয়েছি, এখন আর ভাল লাগে না।"

রমলার মনে পড়ল, ক'দিন আগেও দেবীদাস বলছিলেন, আর কিছুদিন চাকরিটা টেনে যাবেন, তারপর ছেড়ে দেবেন। রমলার সন্দেহ হচ্ছে, কোনো কারণে দেবীদাসের আর উদ্যম নেই, ইচ্ছা নেই; হয়তো তিনি ক্লান্তি অনুভব করছেন খুব।

ক্লান্তি কি রমলা অনুভব করে না? তার কি খুব একটা তৃপ্তি আছে এই ধরনের বেঁচে থাকায়? রমলা বুকের তলায় কষ্ট অনুভব করল, নিশ্বাসের কষ্ট হলে যেমন লাগে অনেকটা সেই-রকম।

দেবীদাস আবার শুতে বললেন। রমলা হাত বাড়িয়ে বালিশ দেখল, তারপর শুয়ে পড়ল। বিছানায় শুলে তার প্রথম কিছুক্ষণ বড় অস্বস্তি হয়, মনে হয় মাথার খোঁপাটা লাগছে, কানের ফুলটা টনটন করছে, হাতের বালা গায়ে ফুটছে। এ-সব কিছু না, তবু অস্বস্তি; কিছুক্ষণ উসখুস করতে হয়।

দেবীদাস হঠাৎ বললেন, "শীতাংশুকে আজ বিকেলে দেখলাম না। ওর স্ত্রী কেমন আছে?"

"ভাল।"

দেবীদাস কি ভেবে বললেন, "ওকে একটু সাবধান করে দিও। এই গরমের মুখটা এখানে ভাল সময় নয়। ও-ভাবে সন্ধ্যেবেলায় মাঠেঘাটে অন্ধকারে যাতে না ঘোরে।"

রমলা বোধ হয় কিছুটা অসন্তুষ্ট হল; বলল, "আমার মাথা গলিয়ে কি দরকার! ভালমন্দ ওরা নিজেরা বুঝুক।"

দেবীদাস সামান্য অবাক হলেন। রমলা এ-ভাবে বড় একটা কথা বলে না।

রমলা হঠাৎ কেমন বিরক্ত হয়ে বলল, "তোমার ছাত্রের বউ কি বিছে চেনে না!···সেদিন ওকে বিছেতে কামড়ায় নি।"

দেবীদাস আর কোনো কথা বললেন না। বিছানায় আরও একটু সরে গেলেন, রমলাকে যেন জায়গা দিলেন হাত ছড়াবার।

বাইরে এতক্ষণে জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে আবার, বাতাসও আসতে শুরু করেছে। জানলা থেকে বিছানাটা এমন কিছু নীচু নয়, গায়ে গায়ে। বাতাস পাওয়া যাচ্ছিল, জ্যোৎস্নাও দেখা যাচ্ছিল। রমলা জ্যোৎস্নার দিকে মুখ করে শুয়ে থাকল।

দেবীদাস খুব আচমকা ডাকলেন, "রমলা!"

রমলা সাড়া দিল অস্পষ্ট করে। মনে হল, যেন কিছু ভাবছে। কিংবা তার তন্দ্রা এসেছে।

দেবীদাস বললেন, "কাল তুমি ঘুম থেকে উঠে বসে ছিলে অনেকক্ষণ।" কথাটা এমন ভাবে শেষ করলেন দেবীদাস যে মনে হল, তিনি যেন জানতে চাইছেন, তোমার কি কিছু হয়েছিল?

রমলার জবাব দিতে ইচ্ছে হল না, অথচ নীরবতাও শেষ পর্যন্ত তার সইল না। বলল, "ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।"

দেবীদাস চুপ করে থাকলেন। তাঁর চোখের পাতা সামান্য বুজে আছে। রমলা শূন্য চোখে বাইরের জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকল। নিঃশব্দ, নির্জন এই ঘরে রাত্রির গাঢ়তা মোলায়েম পোশাকের মতন উভয়কে স্পর্শ করছিল।

রমলা কালকের রাত্রের কথা ভাবল: কাল ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার পর তার মনে হয়েছিল বুকের তলায় ভীষণ এক কম্পন এসেছে, হয় হৃদ্‌পিণ্ড না হয় অন্য কিছু ধকধক করে কাঁপছে। কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে সে জেগে উঠেছে কি না মনে করতে পারল না। এক শারীরিক অস্বস্তি, ক্লেশ তাকে বিচলিত করছিল। মেরুদণ্ড ও পিঠ নুইয়ে হাঁটুতে মাথা রেখে বসে রমলা এই যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করছিল, পারছিল না। মনে হচ্ছিল, সে জলের তলা থেকে ভেসে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করছে—এবং শ্বাসের আশায় সবটুকু শক্তি দিয়ে পরিশ্রম করছে।··· পরে এই অসহ্য কষ্ট কমে গেল ক্রমশ। নিশ্বাস প্রশ্বাস আবার স্বাভাবিক হয়ে এল, যেন দীর্ঘ সময় ডুবে থাকার পর সে আবার ভেসে উঠতে পেরেছে।···তবু দুর্বলতা ছিল, ঠিক যেন স্বাভাবিক হতে পারছিল না। বাইরে তখন চাঁদ ডুবে গেছে, জানলার ওপারে অসাড় রাত্রি, বিশাল মেঘের মত সীমাহীন এক সময় স্থির হয়ে আছে, রাত্রির দণ্ডগুলি ভারী ও দীর্ঘ লাগছিল। খুব নিঃসঙ্গ, ফাঁকা লাগার কথা অনেকক্ষণ নিজেকে বড় একাকী ও পরিত্যক্ত অনুভব করেছে রমলা আজ এখন রমলা কালকের সেই বিমর্ষতা আবার অনুভব করল।

দেবীদাস ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না বোঝা যাচ্ছিল না। রমলা আস্তে করে পাশ ফিরে সোজা হয়ে শুলো। গায়ের শাড়ি আলগা করল, গলার কাছে সামান্য ভিজে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

দেবীদাস ঘুমিয়ে পড়েন নি। বিছানার পাশ থেকে হাত তুলে বুকের ওপর রাখলেন, বালিশে আরও একটু মাথা তুলে নিলেন।

"গরম লাগছে? পাখাটা চালিয়ে দেব কম করে?" রমলা মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল।

"না, গরম না।···তোমার লাগছে?"

"তেমন কিছু নয়।"

"আজ ক'দিন আমার ভাল ঘুম হচ্ছে না।" দেবীদাস বললেন।

কি মনে হল রমলার, স্বামীর দিকে মুখ ফেরাল। বলল, "তুমি আজকাল সন্ধ্যের দিকে বেড়ানো ছেড়ে দিয়েছ—হয়তো তাই।"

"হতে পারে।" দেবীদাস জবাব দিলেন।

রমলা সম্ভবত আরও কিছু ভাঙা অস্পষ্ট কথা আশা করেছিল। দেবীদাস নিরুত্তর থাকায় বোঝা গেল, তিনি ও-প্রসঙ্গে আর কিছু বলবেন না।

সামান্য সময় চুপচাপ থাকার পর রমলা আবার বলল, "কাল রাত্তিরে আমার বুক খুব ব্যথা করে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কি জানি···কোনো অসুখ কি না!"

"আজও আছে ব্যথা?" দেবীদাস শুধোলেন।

রমলার বলার ইচ্ছা হল বলে, হ্যাঁ—আছে। তোমার কি মনে হয় না, এই ব্যথা আমার থাকা উচিত?

জবাব না পেয়ে দেবীদাস বললেন, "অনেক সময় হঠাৎ ব্যথা হয়।"

রমলা বিছানার পাশে স্বামীর মুখ দেখার চেষ্টা করল। বাইরের জ্যোৎস্না ঘরে ঘোলাটে একটু আভা দিয়েছে, সেই জলের মত আলোয় দেবীদাসের নাক, গাল এবং কপালের কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিল। সাদাটে খড়ির মতন নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল।

মনে মনে তিক্ত করে হাসল রমলা, দেবীদাসের বুকে কি ব্যথা হয়?

দেবীদাস বললেন, "কাল সকালে আমায় ডেকে দিও। ভাবছি, সকালের দিকে একটু হাঁটাহাঁটি করব।"

রমলা কি যেন ভাবল, তারপর অস্পষ্ট করে বলল, "দেব।"

দেবীদাস সামান্য নড়ে চড়ে এবার স্থির হয়ে শুলেন। বাইরের বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। রমলা অনুভব করতে পারছিল, তার গলার তলায় ঘাম শুকিয়ে এখন যেন কেমন ঠাণ্ডা লাগছে। নিশ্চল হয়ে সে শুয়ে থাকল।

দেবীদাস যে ঘুমিয়ে পড়লেন রমলা বুঝতে পারল। স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস সত্ত্বেও কেমন একটা গলার শব্দ ওঁর ঘুমের ঘোরে। মনে হয় যেন কোথাও কোনো রকম খুঁত আছে।

রমলা আস্তে করে আবার পাশ ফিরল, জানলার দিকে মুখ। বাইরে পরিচ্ছন্ন জ্যোৎস্না, চিপ্ চিপ্ করে কোথাও পোকা ডাকছিল, বাতাস আসছিল দমকা। চৈত্রের রাত্রি যেন চঞ্চল হয়ে উঠছে এতোক্ষণে।

জানলার ওপারে জ্যোৎস্না ঝিমঝিম করছে, বিছানায় শুয়ে রমলা বস্তুত কিছু দেখতে পাচ্ছিল না—গাছ পাতা আকাশ বা অন্য কিছু, শুধুমাত্র চন্দ্রালোকিত শূন্যতা দেখছিল। এখন যে অনেকটা রাত হয়ে গেছে বেশ বোঝা যায়, পূর্ণ স্তব্ধতার মধ্যে কখনও সেই বুনো পোকার ডাক কাছে আসছিল, কখনও শোনা যাচ্ছিল না। নিঃসাড়, নিদ্রিত আবহাওয়ার মধ্যে শুয়ে থাকল রমলা, যেন এইভাবেই সে শুয়ে আসছে বরাবর।

নিজেকে এ-সময় বড় আশ্চর্য রকমের একাকী মনে হয় রমলার। দেবীদাস পাশে আছেন কি নেই—সে-কথা বড় একটা মনে হয় না; তার ইচ্ছা হয় না স্বামীর গা স্পর্শ করে কোনো রকম সুখ বা সান্ত্বনা খুঁজে নেয়। বরং কখনও কখনও ভাবতে ইচ্ছে করে সে নিঃসম্পর্ক,

তার স্বামী নেই, আত্মীয় বন্ধু কেউ নেই। একার এই জীবনকে সে কেন টেনে যাচ্ছে বুঝতে পারে না, কেন যে সে বেঁচে থাকবে তাও তার কাছে প্রশ্নের মতন মনে হয়।

এই ভাবে বেঁচে থাকার কি সুখ রমলা জানে না। অথবা প্রয়োজন কি তাও তার জানা নেই। বরং সে প্রায়শই গ্লানি অনুভব করে, নিজের দীনতায় পীড়িত হয়। ক্রমাগত এক ক্ষোভ ও নিরাশার মধ্যে বেঁচে থাকতে থাকতে এখন সে ক্লান্ত, এক এক সময় মনে হয়, এর চেয়ে জীবনের সহজ ও স্বাভাবিক প্রাপ্যগুলি যে-কোনো স্থান থেকে সংগ্রহ করে নিলে ক্ষতি কি ছিল!

দেবীদাস পাশ ফিরলেন, ঘুমের ঘোরে অস্ফুট করে কি যেন বললেন, মনে হল ইন্দ্র ড্রাইভারের কথা কিছু বললেন হয়তো। রমলা সামান্য চমকে উঠেছিল, দেবীদাস কি এখনও জেগে আছেন? মাথা পাশ করে রমলা একবার দেবীদাসকে দেখার চেষ্টা করল। ভারী, লম্বা চেহারার মানুষটিকে এ-সময় দেখলে রমলার হঠাৎ যেন কেমন বিরক্তি ও ঘৃণা আসে!

দেবীদাসকে এ-কথা কি কোনোদিন বলা সম্ভব হবে, আমার জীবন তুমিও নষ্ট করেছ, শূন্য অর্থহীন করেছ। আমার কোনো দাম নেই তোমার কাছে। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর নয়।···মানুষে অনেক সময় ঝোঁকের মাথায় কাজ করে। তুমি যে বয়সে আমায় বিয়ে করেছ সেটা ঝোঁকের বয়স না। আমার সৌন্দর্য, দেহমন, স্বভাবচরিত্র—কোনো কিছুতেই তোমার আকর্ষণ ছিল না জেনেও তুমি আমায় বিয়ে করেছ। তুমি অত্যন্ত করুণাপ্রবণ মানুষ। জগতে এ-রকম লোক থাকে। দয়া করা তাদের পক্ষে সহজসাধ্য, দয়ায় তাদের অশেষ তৃপ্তি। তুমি যে একজন দয়ালু, করুণাপ্রবণ, উদাসীন, সৎ ও দেবতুল্য মানুষ এই কথাটা যেন প্রমাণ করেছিলে আমায় বিয়ে করে। আমি এতদিন তোমায় সেই রকম ভাবতাম, তোমায় অপছন্দ করেছি, ঘৃণা করেছি, তবু তোমার ছাত্রের মতন

ভেবেছি তুমি দেবতুল্য। কিন্তু তুমি দেবতুল্য নও। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি তোমার মধ্যে কিছু লুকোনো আছে। সুমিত্রা আসার পর আমি তোমায় যত লক্ষ করছি, তত অবাক হয়ে যাচ্ছি। দেখছি তুমি যেন কিসের এক দোটানায় পড়ে গেছ। এমন কি তুমি মিথ্যে কথা বলছ। আমি জানি, সেদিন সন্ধ্যেবেলায় সুমিত্রার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে তুমি বিকেলে বেড়াতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ। কেন? একটা মানুষ হুড়মুড় করে ছুটে বাড়ি ঢুকলেই কি তাকে বিছেয় কামড়ায়? সুমিত্রা কে? শুধুই কি তার পরিবারের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল? আর কিছু না?

রমলা অত্যন্ত হিংস্র ধরনের এক আবেগ অনুভব করছিল। খুব উত্তেজিত হলে যেমন মাথার মধ্যে দপদপ করে—রমলার কপাল মাথা চোখ জ্বালা করছিল, দপদপ করছিল। সে ভাবছিল, যদি কোনোক্রমে এমন হয়, দেবীদাসের এই অহংকারী, উদাসীন, দয়ালু, অভিজাত মূর্তিটির কোথাও মস্ত চিড় ধরে এবং ভাঙে তবে রমলা সুখী হবে, স্বস্তি পাবে।

৮

যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল রমলা। এখান থেকে স্পষ্ট করে কিছু চোখে পড়ে না, তবু মনে হল সুমিত্রা বারান্দার সামনে ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শীতাংশুকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নিমগাছের আড়াল থেকে সরে এসে সামান্য ইতস্তত করল রমলা, আর কয়েক পা সামনে এগিয়ে গেলেই সুমিত্রা তাকে দেখতে পাবে, এখনও গোধূলির সামান্য আলো আছে। রমলা এগিয়ে যাবে, না ফিরবে, নাকি সামান্য বাঁ দিকে সরে আরও একটু অন্ধকারের আশায় দাঁড়িয়ে থাকবে বুঝতে পারল না। মাথার ওপর দিয়ে দুটি পাখি চলে গেল, বনতুলসীর গন্ধ এল, এবং শেষ চৈত্রের শুকনো উষ্ণ বাতাস কিছু শুকনো পাতার ধুলো উড়িয়ে আনল।

এগিয়ে গেল রমলা। সে এ-রাস্তায় কেন এসেছে বুঝতে পারল না। কিছু ভেবে আসে নি, চলে এসেছে, বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছে। এমন কি তার পোশাকও নিতান্ত সাধাসিধে, ঘরে যা পরেছিল—খুব ফিকে আকাশী রঙের একটা চিকনের শাড়ি, প্রায় যেন সাদা, গায়ে একেবারেই পাতলা সাদা জামা, পায়ে হালকা চটি। বিকেল পড়ে গেলে বাড়ির সামনে পায়চারি করছিল, করতে করতে কখন অন্যমনস্ক ভাবে খানিকটা এগিয়ে এসেছিল, তারপর আর একটু এগিয়ে আসতেই শীতাংশুর বাড়ির সামনে এসে গেছে।

সুমিত্রা দেখতে পেল। খানিকটা তফাতে থাকায় দুজনেই দুজনকে দেখল, কিন্তু কেউ কারুর মুখ লক্ষ করতে পারল না।

কাছে এল রমলা। সুমিত্রা দু-পা এগিয়ে এল, যেন অভ্যাসবশে, সৌজন্যবশে। "আসুন।"

"আসব না", রমলা সামান্য কুণ্ঠা প্রকাশ করে হাসবার মত মুখ করল, "দেখছ না, কি অবস্থায় বেরিয়েছি।"

সুমিত্রা লক্ষ করে দেখল, একেবারে ঘরোয়া পোশাকে উনি এসে পড়েছেন, মাথার চুলগুলোও আলগা করে জড়ানো। সুমিত্রা বলল, "তাতে কি, বেশ তো—"

"বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম—" রমলা যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে, "সারাদিন গরমের পর সন্ধ্যের দিকের বাতাস গায়ে লাগতে বাঁচলাম। ওই হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি।...তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?"

"আজ খুব গরম লেগেছে।"

"গরম আজ বেশ। দুপুরে লুয়ের মত বইছিল।"

দেখতে দেখতে অন্ধকার যেন হুহু করে বয়ে এসে বেশ ঝাপসা করে দিল চারপাশ। রমলা হালকা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে শীতাংশুর গলা শুনতে পেল। ঘরের ভেতর থেকে সুমিত্রাকে ডাকছে। বসার ঘরে বাতি জ্বলে উঠল।

"আসুন", সুমিত্রা আবার ডাকল।

রমলা ইতস্তত করল। বলল, "এখন থাক", বলেই হাসল, "দেখছ না, এখনও মাথায় চিরুনি পড়ে নি।"

"আমি চুল বেঁধে দেব, আসুন।"

"তোমাদের বাঙালী খোঁপা!...আমার অত চুল কই মাথায়!"

সুমিত্রা আর কিছু বলল না। ভদ্রতা করে যতটা আপ্যায়ন সম্ভব—সে করেছে, এর বেশী আর কি করতে পারে। দাঁড়িয়ে থাকল সুমিত্রা।

রমলা ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বলল, "বাড়িতে একেবারে একলা একলা আছি। এস না আজ, যদি পার। তুমি তো যাওই না।"

ফিরেই যাচ্ছিল রমলা, শীতাংশু ততক্ষণে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হল। শীতাংশু নেমে এল বাগানে।

রমলা অনেকটা যেন কথা এড়াবার জন্যেই তাড়াতাড়ি বলল, "এখন

আর যাব না।…ভাল কথা, কাল স্টেশনে গাড়ি নিয়ে কে যাবে? ইন্দ্র?" মনে হল, রমলা বুঝি এই কথাটাই জানতে এসেছে।

"ইন্দ্রই যাবে।"

"ও যা পাগল! ভুলে না যায়!"

"আপনি ভেতরে এসে বসবেন না?" শীতাংশু বলল।

"না, না, এখন না। বাড়ি ফাঁকা।" বলে রমলা এবার সত্যি সত্যিই ফেরার জন্যে পা বাড়াল।

শীতাংশু বলল, "দাঁড়ান, আমি আসছি।"

রমলা বাধা দিতে গেল, তার আগেই শীতাংশু জামা গায়ে দিয়ে আসতে চলে গেছে।

সুমিত্রা দাঁড়িয়ে থাকল। রমলাকে তখন খুব চতুর বলে মনে হচ্ছিল সুমিত্রার। উনি কেন এসেছেন বুঝতে পারার মধ্যে কোথাও কোনো হেঁয়ালি ছিল না।

রমলা বলল, "কি দরকার ছিল পৌঁছে দেবার!" সুমিত্রাকে কথাটা শোনানোর প্রয়োজন বুঝেই বুঝি আপত্তির গলায় বলল।

কথা বলল না সুমিত্রা। তার এখন থাকতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। শীতাংশু হয়তো এমনিতেই আজ ও-বাড়ি যেত, যাব যাব বলছিল; দেবীদাস গত দু দিন হল অফিসের কাজে পাটনা গেছেন, আগামীকাল ফিরবেন। এখন ফাঁকা বাড়ি, রমলার খোঁজ নেবার দায় শীতাংশুর।

রমলা হঠাৎ বলল, "তোমার দেওয়া বইগুলো আমার পড়া হয়ে গেছে। কাল ফেরত পাঠিয়ে দেব।…নতুন আর কিছু আছে নাকি?"

"খুঁজে দেখব", সুমিত্রা নিস্পৃহ গলায় বলল!

"আমি দু চারটে কাগজ আনাই; উনিই আনিয়ে দেন। তোমার যদি লাগে নিতে পার।"

"দেবেন। সময় কাটবে।"

"সত্যি, সময় কাটানো বড় মুশকিল এখানে। আমার মাঝে মাঝে এমন লাগে—!"

"আপনার তবু সয়ে গেছে—। আমার ভাল লাগে না।" সুমিত্রা আকাশের দিকে তাকাল, তারপর বলল, "এখানে আমি থাকতে পারব না। ভাল লাগছে না আমার।"

রমলা দেখল সুমিত্রাকে। অন্ধকারের ছায়া পেনসিলের সিসের ঘন এবং সূক্ষ্ম দাগের মতন সুমিত্রার কপালে গালে চিবুকে লেগে আছে। ওর চোখ রমলাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল।

"উনিও তাই বলছিলেন।" রমলা বলল।

"কে?" সুমিত্রা চমকে মুখ ফেরাল।

"শীতাংশুবাবু। উনি বলছিলেন, তোমার নাকি একেবারেই মন বসছে না।"

সুমিত্রা আর কোনো কথা বলল না। শীতাংশু ততক্ষণে বাইরে এসেছে, গায়ে পাতলা হাফ-হাতা শার্ট। রমলা বেশ বুঝতে পারছিল সুমিত্রা এ-সব পছন্দ করছে না। তার মুখ চোখের ভাব অস্পষ্ট হলেও সুমিত্রার আচরণে বিরক্তি ও অসন্তুষ্ট মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

রমলা অস্বস্তি বোধ করে শীতাংশুকে আবার বলল, "আমি একাই যেতাম, পৌঁছে দেবার কি ছিল!" বলে সুমিত্রার দিকে তাকাল। সুমিত্রা যেন চলে যাবার মতন করে ফিরে দাঁড়িয়েছে। খারাপ লাগল রমলার। কি মনে করে সুমিত্রা তাকে? চাপা এক বিদ্বেষ অনুভব করল রমলা। শীতাংশুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "আসুন—।" আর দাঁড়াল না রমলা, তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। এগিয়ে যেতে তার কানে এল শীতাংশু স্ত্রীকে কি যেন বলছে, কথাগুলো বোঝা গেল না।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল, এখন ধূসরতা প্রায় অন্ধকারের মতন হয়ে গেছে, পায়ের মাটি কালো দেখাচ্ছিল, গাছপালা গাঢ় ছায়ার মতন দাঁড়িয়ে আছে, দু একটা পাখির গলা শোনা যায়। রমলা অনুভব করল শীতাংশু তার পাশে এসে গেছে।

শীতাংশুই কথা বলল হাঁটতে হাঁটতে, খুব আলগা সাধারণ কথা দু-একটা। রমলা জবাব দিল না। নিমগাছের আড়াল পেরিয়ে চলে

এল ওরা। বুনোতুলসীর গন্ধ পেল আবার রমলা। এই গন্ধ আজ তার অন্যরকম লাগছে। উগ্র নয়, কিন্তু ভীষণ ভারী।

"সুমিত্রা বোধ হয় রাগ করল," রমলা বলল হঠাৎ।

শীতাংশু বুঝতে পেরেও না বোঝার ভাব করে জবাব দিল, "রাগ! না, রাগ করবে কেন?"

রমলা কথা ঘুরিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে; বলল, "বার বার বলল ভেতরে যেতে, গেলাম না; রাগ হবারই কথা।"

সুমিত্রার রাগের কারণ দু'জনেই জানে, তবু এই ধরনের একটা এলোমেলো কথা যেন আপাতত রমলা এবং শীতাংশুকে কোনো অস্বস্তি থেকে বাঁচাল।

শীতাংশু বলল, "আপনার কি আর! রেগে থাকলে আমাকেই কথা শোনাবে।" সব জেনেশুনেও শীতাংশু পুরোপুরি চোরের খেলা খেলল, এবং এমন হালকা করে বলল কথাটা যেন সত্যিই রমলা বাড়ির বাইরে থেকে চলে আসায় সুমিত্রা তাকে কিছু বলবে।

কথা না বলে কয়েক পা এগিয়ে গেল তারা পাশাপাশি। শেষে রমলা বলল, "এখানে সুমিত্রার সত্যিই মন টিঁকছে না। কষ্টও হচ্ছে খুব।"

"উপায় কি! কষ্ট হলেও থাকতে হবে।" শীতাংশু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

অল্প চুপচাপ থাকল রমলা, তারপর বলল, "যত দিন যাবে ততই অসহ্য লাগবে।" বলে শীতাংশুর দিকে তাকাল, কি ভেবে যেন অসহ্য লাগার কারণটা ব্যক্ত করল, "একে এই ফাঁকা জায়গা, নির্বান্ধবপুরী, তার ওপর গরম···। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যা চেহারা হয় এখানের···! সইতে পারবে না।"

হাঁটতে হাঁটতেই শীতাংশু জবাব দিল, "সহ্য করে নেবার মন থাকলেই সহ্য হয়। মানুষ সবই সহ্য করে। গরম ঠাণ্ডা, ভিড় ফাঁকা —সবই সয়ে যায়।"

রমলা যেতে যেতে যেন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। থমকে যাবার ভাবটা কোনো রকমে কাটিয়ে নিল। চুপচাপ হাঁটল সামান্য, বলল, "ভুল কথা বললেন, সব জিনিস সহ্য করা যায় না।"

"কি জানি, খুব কিছু না হলে—যেমন বড় কোনো অসুখ-বিসুখের কষ্ট, শোক-দুঃখ—তাই বা কেন, আমরা তো এসবও সহ্য করি। সুমিত্রা নিজেও করেছে।"

"করেছে··· ?"

"বাঃ, করে নি! ওর ছেলের শোক···"

রমলা শুনেছে কথাটা। শীতাংশুই বলেছিল একদিন কি কথায় যেন, পরে সুমিত্রার মুখ থেকেও রমলা শুনেছিল। সুমিত্রার জন্যে এখন কেমন দুঃখ ও মমতা অনুভব করল রমলা। ভগবান ওকে এই সন্তানশোক না দিলেও পারতেন। অবশ্য দুঃখটা স্থায়ী হবে না, সুমিত্রা আবার পাবে।

আমগাছ-তলায় রাস্তাটা পুকুরের কালো জলের মতন হয়ে আছে। মাথার ওপর পাতা নড়ছিল, সরসর শব্দটা মৃদু—কিন্তু দীর্ঘশ্বাসের মতন করুণ। অন্ধকারের মধ্যে যেতে যেতে রমলার হঠাৎ ইচ্ছে হল বলে, মানুষের অনেক কিছু কষ্ট আছে যা সহ্য করা যায় না—যেমন আমার কষ্ট।

শীতাংশু স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে তখনও কথা বলছিল। বলছিল যে, সুমিত্রাকে এমনি খুব শক্ত বলে মনে হয় না, কিন্তু ওর মনের জোর যথেষ্ট। দরকার পড়লে ও সবই মানিয়ে নিতে পারবে।

রমলা সামান্য মুখ নীচু করে পথ হাঁটছিল। ঘন অন্ধকারটুকু পেরিয়ে আসার পর সামনে অনেকটা ফাঁকা মাঠ, তারপর প্রান্তর। পথের পাশে মাঠে নেমে যাবার বাসনা হল তার। ওই মাঠ ধরে সোজা হেঁটে গেলে কোথায় যে যাওয়া যাবে সে জানে না, হয়তো কোথাও নয়, মাঠেই তার ভ্রমণ শেষ হবে।

"ওদিকে কোথায়?" শীতাংশু খেয়াল করিয়ে দিল। রমলা ডানদিকে পথ ঘেঁষে মাঠে নেমে যাচ্ছিল।

খেয়াল হল রমলার। মাঠের পুব ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করে বলল, "এই দিক দিয়েও যাওয়া যাবে, আসুন।"

শীতাংশু জানে যাওয়া যাবে, কিন্তু পথ ছেড়ে মাঠে নেমে যাবার খেয়াল সে বুঝতে পারল না। মাঠে নামল।

হাঁটতে হাঁটতে খানিকটা এগিয়ে রমলা বলল, "আমার একটা কথা জানতে খুবই ইচ্ছে করে।"

শীতাংশু অপেক্ষা করে থাকল।

কুণ্ঠায় যেন কিছুক্ষণ রমলা কিছু বলতে পারল না। শেষে বলল, "আপনার মাস্টারমশাই বলেন, আপনি নাকি কলেজে পড়াব সময় খুব বিখ্যাত ছেলে ছিলেন।" বিখ্যাত শব্দটায় কৌতুকের টান দিল রমলা।

"বিখ্যাত!" শীতাংশু জোরে হেসে উঠল।

"ছিলেন না বিখ্যাত?"

"ছিলাম; পড়াশোনায় নয়।" তখনও হাসছিল শীতাংশু।

"জানি। খুব···কি বলে···গোলমাল করা ছেলে ছিলেন···"

"আনম্যানেজবল্ বয়! পাণ্ডা ছিলাম একজন—"

"তাই। উনি সেদিনও তাই বলেছিলেন।" রমলা খুব অলসভাবে হাঁটছিল; বলল, "বলছিলেন, আপনাকে ওঁর মনে পড়ে গেল ওই পাণ্ডামির জন্যে।" বলে পা টেনে টেনে খুব শিথিল করে হাঁটতে লাগল রমলা, বাতাসে তার শাড়ির আঁচল উড়ছিল, গায়ের অংশ শরীরের সঙ্গে এঁটে যাচ্ছিল।

শীতাংশু বলল, "আমি জানি। মাস্টারমশাই আমায় বলেছেন, চাকরির অ্যাপলিকেশানে আমার নাম দেখে ওঁর আমার কথা মনে পড়েছিল। অবশ্য, কলেজের নামটাও ছিল···তাতে···"

"কলেজ থাক—" রমলা বাধা দিয়ে বলল, "আমি অন্য কথা ভাবি। সুমিত্রার মতন শান্তশিষ্ট মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ে হল কি করে?" নরম, ঘনিষ্ঠ, পরিহাসের সুর রমলার গলায়।

শীতাংশুর হাসি পাচ্ছিল। কি বলা যায়! ঘাড় চুলকে বলল, "কী জানি! হয়ে গেল!"

রমলা মুখ ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করল শীতাংশুকে, গাল মুখ থেকে উড়ন্ত চুল সরিয়ে নিতে নিতে বলল, "আপনি দেখছি খুব লজ্জা পাচ্ছেন!"

"লজ্জা!···না, না—"

"না আর কোথায়, বেশ লজ্জা," রমলা হেসে উঠল।

ততক্ষণে বাড়িতে প্রায় পৌঁছে গেছে রমলা। আলো জ্বলছিল বারান্দায়, ঘরে। ইন্দ্র গাড়ি রেখে গেছে বারান্দার সামনে।

শীতাংশু বলল, "আপনি তো জানেন, জন্ম মৃত্যু বিবাহ—এ কারও হাতে নয়।"

"ও তো পাঁজির কথা," রমলা হাসির রেশ রেখেই জবাব দিল। তারপর বলল, "চলুন, বাগানেই বসি। বেশ সুন্দর হাওয়া।"

ফটক বন্ধ ছিল, শীতাংশু খুলে ধরল। রমলা ভেতরে এল, কাঁকরমাটির পথ, সামান্য এগিয়ে ঘাসের লন মতন, ঘাস প্রায় নেই। আশেপাশে বাগান, কোথাও একটু ঝোপ মতন, কোথাও স্বল্পপত্র কোনো ফুলগাছ। বারান্দার দিকে এগুবার সময় ফুলের ফিকে গন্ধ এল, মনে হল কাছাকাছি কোথাও বেলফুল ফুটেছে।

রমলা হালকা ছাঁদে, একটু যেন এলোমেলো পায়ে হাঁটছিল। শাড়ির আঁচলের প্রান্ত আঙুলে জড়িয়ে এমন করে রমলাকে হাঁটতে আগে কখনো দেখে নি শীতাংশু। তার ভাল লাগছিল।

বারান্দায় উঠে রমলা চাকরকে ডাকল। শীতাংশু লক্ষ করে দেখল, রমলার মাথায় কোনো ময়লা উড়ে এসে পড়েছে। তুলো, না সুতোর আঁশ বুঝতে পারল না। ততক্ষণে চাকর বেরিয়ে এসেছে, মাঝবয়সী দেহাতী ঝিকেও মাঝ বারান্দায় দেখা গেল।

চাকরকে বেতের চেয়ার নামিয়ে দিতে বলল রমলা, বলেই কি মনে করে তার জন্যে ডেক চেয়ার নামাতে বলল। ঝিকে বলল চা

করতে। তারপর শীতাংশুর দিকে মুখ ফিরিয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই শীতাংশু বলল, "আপনার মাথায় কি একটা পড়েছে।"

রমলা হাত ওঠাল, "কি পড়েছে?…কই…?" রমলা চুলের ওপর হাত ঘাঁটছিল।

শীতাংশু বলল, "আঁশটাঁশ হবে।"

"পাখির ময়লা নয়তো!…দেখুন—" রমলা একেবারে ছেলেমানুষের মতন গলা করল। মাথা হেলিয়ে দিল শীতাংশুর দিকে।

"না। তুলোর আঁশ বলেই মনে হচ্ছে।"

"নিজের মাথা নিজে দেখা যায়? দিন না পরিষ্কার করে।"

শীতাংশু হাত দিয়ে শুকনো বটপাতার পাতলা জালিটা তুলে নিল। এই প্রথম সে রমলার শরীর স্পর্শ করল। শীতাংশু রোমাঞ্চিত হল না, আত্মীয়জনের মত প্রীতি ও অন্তরঙ্গতা অনুভব করল।

রমলা বলল, "আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।"

নীচে নামল শীতাংশু, বাগানে পায়চারি করতে লাগল। এখানের রুক্ষতা এত বেশী যে এ-সময় গাছপালা বাঁচিয়ে রাখা দুঃসাধ্য, এ-বাড়িতে তবু কিছু বেঁচে আছে, কুয়ার জল টেনে টেনে অতিকষ্টে বাঁচিয়ে রাখা। বিকেলে গাছের গোড়ায় জল পড়েছিল, কচিৎ যেন সেই ভেজামাটির গন্ধ আসছে। আকাশ তারায় তারায় ভরে এল। চৈত্রের আকাশ খুব পরিষ্কার। সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে শীতাংশু জবাগাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। সুমিত্রার গল্প করবে নাকি রমলাদির কাছে? উনি আসলে যা বলতে চান শীতাংশু বুঝতে পেরেছে। বিয়ে হবার আগে সুমিত্রার সঙ্গে তার পরিচয়-টরিচয় ছিল কি না জানার কৌতূহল বোধ করেন উনি। করা খুবই স্বাভাবিক, তাকে এবং সুমিত্রাকে দেখলে বোঝাই যায়…বোঝাই যায় এটা ঠিক পাঁজির গণনা অনুসারে হয় নি।

মন্থর পায়ে পায়চারি করতে করতে শীতাংশু লনের কাছে এল,

চেয়ার পেতে দিয়ে গেছে চাকরে। শীতাংশু আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গভীর করে সিগারেটের শেষটুকু টেনে ধোঁয়া গিলল, তারপর টুকরোটা ফেলে দিল।...পাঁজির হিসেবে অনেক কিছুই হয় না, শীতাংশু মনে মনে হাসল, ভাবল : সুমিত্রার সঙ্গে আমার বিয়ে যেমন ঘটকালির নয়, তেমনি রমলাদির বিয়েও ঘটকালিতে হয় নি। বিশ্বাস করা মুশকিল, দেবীদাসবাবু বেশ বেশী বয়সে হঠাৎ একদিন পাত্রী পছন্দ করে এসে রমলাদিকে বিয়ে করলেন। অসম্ভব, এ-রকম হতেই পারে না। কোথাও কিছু একটা রহস্য আছে। কোথায়, কি ভাবে রমলাদির সঙ্গে দেবীদাসবাবুর পরিচয় হয়েছিল, এবং কি করে বিয়ে হল জানতে শীতাংশুর খুবই কৌতূহল। সত্যিই কি রমলাদি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী? ওঁকে যে খুব সুখী, তৃপ্ত মনে হয় না, বরং কোনো বিষাদের মধ্যে রয়েছেন বলে মনে হয়—এর কারণ কি স্বামী-স্ত্রীর জীবনের কোনো অশান্তি? রমলাদি অত্যন্ত চাপা, ওঁর সমস্ত ব্যবহার ওপর থেকে এমন পরিপাটি যে সহজে কিছুই বোঝা যায় না, উপায় বাখেন না বোঝার। কিন্তু শীতাংশু ক্রমশ বুঝতে পেরেছে, ইদানীং যেন আরও বোঝা যাচ্ছে, রমলাদি কেমন কাতর ও অস্থির হয়ে উঠেছেন, সামান্য বিষয়েও আহত হন।...আজ হঠাৎ উনি অনেকটা হালকা ও হাসিখুশী হয়ে ওঠায় শীতাংশুর ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল, মনের কোনো গুমোট কেটে গেছে ওঁর, কেটে গিয়ে বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠেছেন।

রমলা এল। আগের পোশাক, মাথার চুল একটু যা পরিষ্কার করে নিয়েছে। চা দেয় নি দেখে ঝিকে ডাকাডাকি করল, তারপর ক্যাম্বিসের হেলানো চেয়ারে বসল আঁচল গুটিয়ে।

শীতাংশু বলল, "আমরা এবার বাইরে শুতে শুরু করব। বারান্দায় কিংবা মাঠে। এখানে গরমে সবাই বাইরে শোয় দেখছি। কি রকম সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে দেখছেন।"

"আমি তো শুই।" রমলা জবাব দিল, "তবে একেবারে মাঠে নয়, বারান্দায়।" বলে কি মনে করে আবার বলল, "উনি আগে খুব গরম পড়লে দু-চার দিন শুতেন, এখন আর শোন না।"

"মাস্টারমশাইয়ের গরমও নেই, শীতও নেই। অদ্ভুত মানুষ!" শীতাংশু হেসে বলল।

"অদ্ভুত···!" রমলা খুব অস্পষ্ট করে বলল, অন্যমনস্ক স্বরে।

শীতাংশু তেমন করে খেয়াল করল না। দেবীদাসের কোনো গল্প তার মনে পড়ে গেল। বলল, "মাস্টারমশাইকে আমরা কলেজে যেমন দেখেছি, এখনও প্রায় সেই রকমই আছেন। একবার খুব মজা হয়েছিল···।"

রমলা কোনো রকম সাড়া শব্দ করল না।

শীতাংশু দেবীদাসের সম্পর্কে একটা গল্প বলল, চমৎকৃত হবার মত কিছু নয়, তবে তাতে দেবীদাসের অন্যমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়।

রমলা এই মজার গল্প শুনল কি না মনোযোগ দিয়ে, বোঝা গেল না। শীতাংশু সামান্য হেসেছিল গল্প শেষ করে, রমলা সে-হাসির কোনো সমর্থন জানাল না। সামান্য পরে বলল, "আজকাল কিন্তু ওঁর শীত আছে।"

"আছে? কই—" শীতাংশু মনে করবার চেষ্টা করল, সে শীতে এসেছে, শীতের মধ্যে দেবীদাসকে দেখেছে, জড়সড় বা কাতর হতে দেখে নি, "কই, শীতে আমি ওঁকে···"

"থাকা মানেই কি দেখানো?" রমলা বাধা দিল, তারপর অন্য কথায় চলে গেল।

কয়েকটা এলোমেলো কথা হল। ততক্ষণে ঝি এসেছে চা নিয়ে। চা খেতে খেতে শীতাংশু দূরে টর্চের আলো জ্বলতে দেখল। সুমিত্রাই আসছে তবে। আসার সময় বার বার বলে দিয়েছিল শীতাংশু।

"সুমিত্রা আসছে," শীতাংশু বলল, ইশারা করল আলোর দিকে।

রমলা তাকাল, দেখল। কোনো কথা বলল না।

আলোটা একবারও নিবলো না, সরাসরি গেট পর্যন্তও এল না, কাছাকাছি এসে ডানহাতি পথ ধরে চলে গেল। না, সুমিত্রা নয়। শীতাংশু ক্ষুণ্ণ হল। তার লজ্জা হল, কথাটা সে কেন আগেভাগে বলতে গেল বাহাদুরী করে। সুমিত্রা যে আসবে না—জানা কথা। সে এ-বাড়ি আসে না, এক আধবার যা-ও এসেছে নিতান্ত যেন জোর করে বেঁধে-ধরে আনা, বা এমন সময় এসে রমলার সঙ্গে দেখা করে গেছে, যখন দেবীদাস নেই। আজ সুমিত্রা আসতে পারত, দেবীদাস এখানে নেই।

শীতাংশু কেমন অপ্রতিভ হয়ে বলল, "না, সুমিত্রা নয়।···আমি ভেবেছিলাম ও আসছে।"

রমলা মুখ তুলে শীতাংশুকে দেখার চেষ্টা করল। অন্ধকার যথেষ্ট ঘন, কিছুই দেখা যায় না। কয়েক মুহূর্ত কিছু যেন ভাবল রমলা, তারপর বলল, "সুমিত্রা এখানে আসা পছন্দ করে না।"

হঠাৎ যেন মুখের ওপর কি পড়েছে, চমকে ওঠার মতন হল শীতাংশুর। কথাটা কখনও এভাবে খোলাখুলি বলেন নি রমলাদি, আজ বললেন। ওঁর গলার স্বর শান্ত, একটু হয়তো রুক্ষ। শীতাংশু কুণ্ঠিত হল। বলল, "না, তা নয়। অপছন্দ করবে কেন?···ও আসলে একটু ঘরকুনো, বাড়ি ছেড়ে বেরোতে চায় না।···তা ছাড়া শরীরটাও ভাল থাকছে না; কি জানি···"

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল শীতাংশু, রমলা অসহিষ্ণুর মতন বাধা দিল। বলল, "আপনি ওর হয়ে যা বলার বলুন, আমি যা বোঝার ঠিকই বুঝতে পারি।"

সহসা যেন চৈত্রের হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল; আড়ষ্ট, গুমোট লাগছিল। কপালের পাশে এবং চোখের কোণ জ্বালা করে উঠল শীতাংশুর। ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করছিল। নিজেকে যেন অপরাধী মনে হচ্ছিল। রমলাদি অসম্ভব ক্ষুণ্ণ, আহত। হয়তো অপমানিত বোধ করেছেন সুমিত্রার ব্যবহারে। নিজেকে এ-সমস্তর জন্যেই দায়ী ভেবে শীতাংশু মর্মাহত হচ্ছিল।

রমলা বলল, "আমি কিছুদিন থেকেই ভাবছি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, করতে খারাপ লাগে, আপনি কি মনে করবেন কে জানে!"

"আমি কিছু মনে করব না," শীতাংশু কোনোরকমে বলল, যেন এই অবস্থা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে নিস্তার পেতে চায়।

রমলা বলল, "আমাব ওপর ওর রাগ কেন, আমি কি কিছু করেছি! যাব জন্যে রাগ সে তো···"

"আপনার ওপর ওব রাগেব কিছু নেই; কি থাকবে—" শীতাংশু তাড়াতাড়ি বলল, রমলা আবও কি বলতে যাচ্ছিল শেষ পর্যন্ত শুনল না। কথা চাপা দেবার আপ্রাণ চেষ্টায় শীতাংশুকে অসহায়ের মতন মনে হচ্ছিল।

রমলা বিন্দুমাত্র কান করল না শীতাংশুর কথা। ক্ষোভ, রাগ, তিক্ততা এবং অসহ্য কোনো বিতৃষ্ণায় তার সমস্ত মন ও আবেগ ঘৃণায় আক্রোশে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। কোনো কিছুই এখন তার কাছে গ্রাহ্যেব বিষয় নয়, উচিত-অনুচিত বিবেচনা করার বোধ তার নেই। রমলা অস্বাভাবিক তিক্ত ও তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "আমি আপনাদের কাউকে চিনতাম না। আপনাদের কার সঙ্গে কার কি রকম পরিচয় ছিল, সম্পর্ক ছিল আমি জানি না। কলকাতায় আপনাদের যে চিনত সে আপনাদের মাস্টারমশাই। সুমিত্রার রাগ তার ওপর। কেন? কি জন্যে এত রাগ?"

শীতাংশুর মনে হল, রমলা যেন হিংস্র, বেপরোয়া হয়ে মস্ত একটা আড়াল একটানে সরিয়ে চোর-ধরার মতন তাকে ধরে ফেলেছে, সরে যাবার বা পালাবার পথ নেই, মুখোমুখি সে রমলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গলার কাছে আড়ষ্ট বাতাস, বুকের কোথাও বুঝি কোনো আশঙ্কা ভারি হয়ে উঠছিল। বিমূঢ় হয়ে অন্ধকারে বসে থাকল শীতাংশু।

রমলা আর পিছু দিকে ফিরবে না, এখন সে মরিয়া হয়ে এগিয়ে

এসেছে, এই লুকোচুরি খেলা ভাঙবে। যদি এমন হয়, আরও নামতে হয়, তলিয়ে দেখতে হয়, দেখবে ; যে গোপনতা এত রহস্যময়, ক্রমাগত তাদের প্রত্যেকের সম্পর্ককে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করছে, জটিল করে তুলছে—সেই গোপনতাকে সে জানবে। দেবীদাসের বাঁধানো ও সুন্দর করে সাজানো ছবির তলায় কি আছে দেখে নেবার চেষ্টা সে ছাড়বে না।

রমলা বলল, "সুমিত্রার এই রাগের কথা আপনি জানেন। জানেন না—?"

শীতাংশু মাথা নেড়ে না বলতে গিয়েও বলতে পারল না। তার এখন পর্যন্ত কোনোদিন এ-কথা খেয়াল হয় নি, সুমিত্রা আসার পর রমলাদির সংসারেও চাপা এক অশান্তি চলছে, অন্তত রমলাদির মনে। উনি কখনও কথাটা এ-ভাবে বুঝতে দেন নি। আজ শীতাংশু বুঝতে পারছে। আরও কিছু এখন তার মনে হচ্ছিল : দেবীদাসের মতন মানুষও তবে কি একটা সাধারণ ঘটনার জের টেনে যাচ্ছেন এতকাল পরে! অসম্ভব নয়, কেননা এখন পর্যন্ত দেবীদাস এমন কোনো ব্যবহার প্রকাশ করেন নি যাতে মনে হয় সুমিত্রা আসায় তিনি আনন্দিত, বা একদা তাঁর সঙ্গে সুমিত্রাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুমিত্রার মতন দেবীদাসও যেন পূর্বের সমস্ত পরিচয় সরিয়ে রেখে দূরে থাকতে চান। যদি এমন হত, দেবীদাস ঘটনাটা ভুলে গেছেন বা তার কোনো মূল্যই দেন না, তবে নিজের স্ত্রীর কাছেও অন্তত সে-কথা বলতে পারতেন। রমলাদির এই অশান্তি এবং অসহিষ্ণুতা দেখে সন্দেহ হচ্ছে, দেবীদাস যেন ঘটনাটা প্রকাশ করেন নি। কিংবা প্রকাশ করলেও এমন ভাবে করেছেন যাতে রমলাদির মনে কোনো সন্দেহ থেকে গেছে।

সন্দেহ কথাটা মনে আসতেই যেন বিশ্রী কোনো ঝাঁঝ লাগল। সুমিত্রাকে কি সন্দেহ করেন রমলাদি? কিসের সন্দেহ? শীতাংশুর কান, কপাল, চোখ তপ্ত হয়ে উঠল। আচমকা কেমন এক আতঙ্ক অনুভব করল সে।

অপেক্ষা করে করে রমলা অধৈর্য হয়ে বলল, "সুমিত্রার কাছে আপনি কিছু শোনেন নি ? কিছু বলে নি সে ?"

শীতাংশুর মনে হল, রমলাদি তাকে বিশ্বাস করছেন না, এমন কি তার ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছেন। ভাল লাগল না। শীতাংশু বলল, "শুনেছি। আমি যা জানি, আপনিও জানেন।"

"না। আমি কিছু জানি না।" রমলা থমথমে গলায় বলল, 'আপনার মাস্টারমশাই শুধু বলেছেন, সুমিত্রাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা ছিল।"

শীতাংশু বলবে কি বলবে-না করে শেষে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "আর কিছু বলেন নি ?"

"না।"

"আপনি জিজ্ঞেস করেন নি ?"

"না।"

ভাবছিল শীতাংশু। দূরে আবার বুঝি কে যাচ্ছে আলো জ্বেলে জ্বেলে। অন্ধকারে রমলাদিকে দেখা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে। এ তবু অনেক ভাল, অনেক স্বস্তির, অন্ধকার তাদের অনেক সঙ্কোচ যেন সরিয়ে রাখতে পারছে। কয়েক মুহূর্ত খুব অস্বস্তিকর মনে হল; দেবীদাসের জীবনের গোপনতা প্রকাশ করা তার উচিত নয়। তুমি তাঁর কাছে ঋণী, তোমার কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা উচিত। শীতাংশু বলতে যাচ্ছিল, 'আমিও বেশী কিছু জানি না—', কিন্তু সে বুঝতে পারল, রমলাদি তার কথা বিশ্বাস করবেন না। ওঁর মনে কোথাও এক গভীর সন্দেহ রয়েছে। কি ধরনের সন্দেহ ? সহসা শীতাংশুর আবার সুমিত্রার কথা মনে হল। সুমিত্রার সঙ্গে এই সন্দেহের যোগাযোগ করেছেন নাকি রমলাদি ? শীতাংশু নিজের স্ত্রীকে এই সমস্ত মালিন্য ও হীনতা থেকে মুক্ত দেখতে চাইল। বলল, "আমি শুনেছি, সুমিত্রার দিদি—অঞ্জুদির সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল। পরে আর বিয়ে হয় নি।"

রমলা নিশ্চল এক ছায়ার মতন বসে ছিল, যেন এই ছায়া অপ্রাকৃত কিছুর, যার সামনে শীতাংশু বড় অসহায়। তার পক্ষে ওই ছায়া ডিঙিয়ে চলে যাওয়া সাধ্যাতীত।

মুহূর্ত কয় পরে রমলা বলল, "বিয়ে হয় নি কেন?"

"কি জানি!···শুনেছি, অঞ্জুদির খুব অসুখ হয়েছিল।"

রমলা কেমন একটা শব্দ করল, মনে হবে এই জবাব যে কত হাস্যকব যেন তা প্রকাশ করল।

শীতাংশু মনে মনে বলল: বিশ্বাস কবা মুশকিল! কিন্তু উপায় কি!

"কি অসুখ?" রমলা শুধলো।

"জানি না, সুমিত্রা বলে নি···সেও ঠিক জানে না।"

"কেন, তার কি জানার বয়েস হয় নি তখন?"

"ষোলো সতেরো বছর বয়েস।"

রমলা কি বলতে যাচ্ছিল, ঠোঁটের ডগা থেকে কথা ফিরিয়ে নিল।

কোনো পক্ষ থেকেই আর কেউ কথা বলছিল না। শীতাংশুর মনে হল, এবার তার চলে যাওয়া উচিত, বমলাদি এখন আর তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। নিজেব মনেই কিছু ভাবছেন উনি। অত্যন্ত অন্যমনস্ক, গম্ভীর।

শীতাংশু জড়ানো গলায় বলল, "মাস্টারমশাই আমার শ্রদ্ধার পাত্র। আমার এ-সব কিছু বলা উচিত ছিল না···। তিনি যদি শোনেন, কি যে ভাববেন আমায়···!"

"তিনি শুনবেন," রমলা নির্মম, শক্ত গলায় বলল, "কি ভাববেন আমি জানি না। আমার ইচ্ছে নেই জানবার।"

শীতাংশু উদ্বেগ ও বিব্রত বোধ কবল, কি বলবে ভেবে পেল না। কোনো রকমে বলল, "আমি খুব লজ্জায় পড়ব।"

রমলা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না, শেষে বিষণ্ণ গলায় বলল, "আপনিও তো অশান্তিতে পড়েছেন। পড়েন নি! তবে?"

৯

ওরা চলে গেল। দেবীদাস বাগানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর পায়ের তলার শুকনো ঘাস আবীরে লাল হয়ে গেছে, আশপাশের ফুলগাছের পাতায় গুঁড়ো জমেছে আবীরের। বাতাসে তখনও সেণ্টের চড়া গন্ধ ভাসছিল। দেবীদাস সামনের দিকে হালকা চোখে তাকিয়ে থাকলেন: ওরা অনেকটা চলে গেছে, তাঁর অফিসের লোকজন—ইন্দ্র, কিশোরীলাল, দরোয়ান, মালী, পিয়ন প্রায় বিশ পঁচিশজনের ছোটখাটো একটি দল। সামান্য এগিয়ে গিয়ে ওরা আবার যথারীতি খঞ্জনি আর ঢোলক বাজিয়ে আবীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে ফাগুয়ার গান গেয়ে গেয়ে চলে যাচ্ছিল, সম্ভবত শীতাংশু আর শর্মাদের কোয়ার্টারের দিকে।

নিজের মুখশ্রী এবং মূর্তি দেবীদাস দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু অনুমান করতে পারছিলেন। বছরের এই দিনটিতে দেবীদাসকে ওদের আনন্দের অংশীদার হতে হয়। খারাপ লাগে না তাঁর, বরং কপালের আবীরের উষ্ণতা কখনও কখনও যেন অতিরিক্ত কোমল ও উষ্ণ হয়ে হৃদয় স্পর্শ করে।

আজ ওরা আসার আগে আগেই দেবীদাস তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন। একেবারে খাঁটি বাঙালী ভদ্রলোকের মতন এক জরিপাড় ধুতি বের করে পরেছিলেন, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি। এই বেশবাস পরে আয়নায় নিজেকে দেখতে গিয়ে দেবীদাস হঠাৎ ছেলেমানুষের মতন হেসে উঠেছিলেন। রমলা কাছে ছিল না, নয়তো জিজ্ঞেস করতে পারত, হঠাৎ এত হাসির কি হল?

হাসির বস্তুত কিছু হয় নি; কিন্তু অনভ্যাসের দরুন নিজের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা চেহারাটা দেবীদাসকে কেমন কৌতুককর করে তুলেছিল;

নিজের চোখেই কেমন যেন লাগছিল। গাম্ভীর্যের বদলে খোলামেলা ঘরোয়া ভাব এসে গিয়েছিল চেহারায়।

রমলা অনেকবারই বলেছে, 'তোমার এই ধুতি পাঞ্জাবি আলমারিতে থেকে থেকেই পিঁজে এল, বছরে তো বড়জোর দুদিন পরবে, সেই দশমীর দিন আর এই দোলের দিন, অনর্থক ও দুটোকে ধুয়ে কেচে আগলে রাখা।

ধুতিটা যে যথেষ্ট পুরোনো হয়ে গেছে দেবীদাস আজ বুঝতে পারলেন। ওরা যখন জনে জনে দেবীদাসের কপালে মস্ত মস্ত আবীরের টিপ দিয়ে গলায় এক মালা ঝুলিয়ে দিল তখনও দেবীদাস নিজের সাজসজ্জা সম্পর্কে যথেষ্ট আশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি কোঁচার আগা দিয়ে আবীর মুছতে গেলেন কাপড়টা কেমন যেন টান পড়ে ফরফর করে ছিঁড়ে গেল। দেবীদাস ওদের সামনে হঠাৎ বড় অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন। কিন্তু তা মানিয়ে নিলেন। মানিয়ে নিয়ে ওদের দিকে দু মুঠো আবীর ছুঁড়ে দিলেন ওদেরই আনা আবীর থেকে। ওরা যথারীতি থালা সাজিয়ে এনেছিল, মেঠাইমণ্ডা, কিছু ফল, সেণ্ট মেশানো এক ঠোঙা আবীর, কিছু এলাচদানা, একটিন দামী সিগারেট। সিগারেটের টিনটা আগে থাকত না, এবারে নতুন, কার বুদ্ধিতে এটা ঘটেছে দেবীদাস ভেবে পেলেন না। ইন্দ্রর নাকি ?

ইন্দ্রটা যে আজ খানিকটা নেশাভাঙ করেছে দেবীদাস বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। হতভাগা দূরে দূরে ছিল। বাড়ির মধ্যে থেকে ঝি-চাকরে মিলে সরবত আর স্টেশনের হালুইকর কালীরামের বালুসাই এনে দিল। ওরা যে যার মত সরবত-টরবত খেল, তারপর দেবীদাসের হাত থেকে বাৎসরিক পাওনা ত্রিশটি টাকা নিয়ে আবার আবীর ছড়াতে ছড়াতে গান গেয়ে গেয়ে চলে গেল।

রমলার জন্যেও ওরা একটা মালা আনে, পায়ের কাছে রেখে দিয়ে করজোড়ে নমস্কার জানায়। আজও এনেছিল। কিন্তু রমলা অন্যান্য

বারের মতন বেশীক্ষণ তাদের কাছে দাঁড়াল না, তেমন হাসিখুশী মুখে সৌজন্যসুলভ কথাবার্তাও বড় বলল না।

দেবীদাস বাগানে পায়চারি করলেন খানিকটা। ওদের আর দেখা যাচ্ছে না, কখনও কখনও অস্পষ্ট ভাঙা ভাঙা কিছু কলরব ভেসে আসছে দূর থেকে। বিকেল পড়ে গিয়ে গোধূলি নেমেছিল। দেবীদাস সেই বিচিত্র মুখশ্রী নিয়ে বাগানে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন।

আজ দিনটি বড় সুন্দর হয়ে ছিল। আকাশ অতি মনোরম ও মনোহর দেখাচ্ছিল। গোধূলির আলো যেন গগনপ্রান্তকে প্রসাধিত করার পরপরই চাঁদ উঠে গেল, পূর্ণ উজ্জ্বল চাঁদ। মৃদুমন্দ বাতাসও ক্রমে চঞ্চল হয়ে উঠছিল।

দেবীদাস বার বার বারান্দার দিকে মুখ ফিরিয়ে রমলাকে খুঁজছিলেন, দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি আশা করছিলেন রমলা এবার বাইরে বাগানে এসে দাঁড়াবে, রমলা আসছিল না। অনেকক্ষণ যাবৎ কারও জন্যে অপেক্ষা করলে যেমন চঞ্চল হওয়া স্বাভাবিক দেবীদাস অবশেষে সেই রকম চাঞ্চল্য অনুভব করলেন। সম্ভবত তাঁর ঈষৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল।

বাগানের মাটিতে, ঘাসে, ফুলগাছের পাতায় যেখানে যেটুকু আবীরের গুঁড়ো পড়েছিল ক্রমশ তা ছায়ার মতন হয়ে এল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পূর্ণিমার স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল আলোকের জন্যে সন্ধ্যা বোঝা যাচ্ছিল না। পাখিগুলি আজ অনেক বিলম্বে যেন ফিরে এল, চৈত্রের বাতাস এলোমেলো হয়ে উঠছিল মাঝে মাঝে, দেবীদাস কেমন উন্মনা হয়ে পড়ছিলেন। রমলাকে এ-সময় তিনি সাগ্রহে প্রত্যাশা করছিলেন, হয়তো কথা বলার ইচ্ছা করছিল, কিংবা এখন তিনি তাঁর পাশে রমলার উপস্থিতি আকাঙ্ক্ষা করছিলেন আনন্দ ও সুখ বশে, অথবা নিতান্ত অভ্যাসগত কারণেই যেন তিনি রমলাকে আশা করছিলেন।

রমলা এল না। দেবীদাস সামান্য সময় আরও অপেক্ষা করলেন, তারপর বারান্দার দিকে চলে গেলেন।

বসার ঘরে রমলা ছিল না, শোবার ঘরেও নয়। ঘরে বাতি জ্বলছিল। দেবীদাস বসার ঘর দিয়ে বাড়ির পিছনদিকের ছোট ঘেরা বারান্দায় এসে রমলাকে দেখতে পেলেন। বাঁদিকে প্যাসেজ ; সিমেন্টের জালি করা একটা পাশ, অন্য দিকটায় দেওয়াল ; প্যাসেজের ও-প্রান্তে রান্নাঘর, এ-প্রান্তে দরজা দিয়ে প্যানট্রিতে যাওয়া যায়, সামনের বারান্দাতেও।

রমলা ঘেরা বারান্দার ডান দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখের সামনে আড়াল, চৌকো চৌকো সিমেন্টের জালি। সংসারের কিছু অব্যবহৃত উপরি-জিনিস এখানে পড়ে থাকে ঃ কয়েকটা ফুলের টব, জলের ড্রাম, গোল করে পাকানো হোস পাইপ, পুরোনো ভাঙা চেয়ার, রঙের কৌটো ইত্যাদি পড়ে ছিল। ওপাশে প্যাসেজে বাতি জ্বলছিল, এদিকটায় বাতি নেবানো।

দেবীদাস লক্ষ করে দেখলেন রমলা বিকেলের পোশাক বদলে নিয়েছে। তার গায়ে সাদা শাড়ি। ফিকে বেগুনী রঙের সরু পাড়, তাঁর তেমন নজরে পড়ছিল না। হয়তো এলো করে চুল বেঁধেছে রমলা, খোঁপাটি ঘাড়ের কাছে পুরু হয়ে ছিল।

দেবীদাস বললেন, "তুমি এখানে···!" তিনি যে ঠিক কি বলতে এসেছেন বা বলতে চান বোঝা গেল না।

রমলা কোনো সাড়া দিল না। গায়ের আঁচল সামান্য টেনে নিল। তার আচরণ দেখে মনে হয়, দেবীদাস পাশে এসেছেন রমলা জেনেছে।

দেবীদাস রমলার প্রায় পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হল বলেন, রমলার জন্যে তিনি অপেক্ষা করছিলেন অনেকক্ষণ। বললেন না, কথাটা তাঁর মুখে এল না। কি বলবেন আপাতত তাও যেন ভেবে পেলেন না। শেষে হালকা স্বরে বললেন, "আজ বড় লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলাম।"

রমলা সামান্য ঘাড় সরিয়ে পাশ করে তাকাল। দেবীদাসের মুখ

কালচে দেখাচ্ছিল, আবীরের লাল এখন আলোকাভাবে কালচে দেখাচ্ছে।

দেবীদাস বললেন, "আমার ধুতিটা ওদের সামনে ছিঁড়ে গেল।" তাঁর গলার স্বরে সাধারণ কৌতুক ও ঈষৎ লজ্জা ছিল।

রমলা দেবীদাসের ধুতির দিকে তাকাল, বুঝতে পারল না। আবার চোখ তুলে স্বামীর মুখ দেখল। প্রায় পাকা স্বল্প চুলের ওপর আবীর ছড়ানো রয়েছে বলে মনে হল। এই মুখটি এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে, দেবীদাসের স্বাভাবিক মুখ নয়, বরং হাস্যকর কোনো মুখোশ পরে থাকার মতন। কপাল, গাল, গলা আবীরে মাখা।

দেবীদাসই কথা বললেন আবার। কোঁচা তুলে ধুতির ফেঁসে যাওয়া অংশটা দেখাতে দেখাতে বললেন, "তুমি ঠিকই বলতে—এটা একেবারে পুরোনো হয়ে গেছে।"

রমলার হঠাৎ অন্যরকম এক চিন্তা এল। দেবীদাস অনেক জিনিসই যে তুলে রেখে দেন, ব্যবহার করেন না, এবং লৌকিকতার সময় শোভা ও মর্যাদার খাতিরে তা পোশাকি মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করেন—এ-কথাটা হয়তো দেবীদাস জানেন না। তাঁকে কথাটা জানিয়ে দেওয়া উচিত। রমলার ইচ্ছে হল বলে, শীঘ্রি একদিন দেখবে বাইরের লোকের চোখে তোমার আরও কিছু তুলে রাখা জিনিস ওই ভাবে ফেঁসে যাবে। আজ যত লজ্জা পেয়েছ তার চেয়েও বেশী লজ্জা তোমায় পেতে হবে। সে-লজ্জা তুমি সামলাতে পারবে না।

দেবীদাস রমলার মুখ দেখছিলেন। মনে হল না তিনি কিছু বুঝতে পারলেন। অথচ তাঁর চোখের দৃষ্টি রমলাকে যথাসাধ্য অনুভব করার চেষ্টা করছিল।

রমলা অন্যদিকে তাকাল, দেবীদাসের শান্ত স্থির দৃষ্টি তার ভাল লাগছিল না।

দেবীদাস সামান্য অপেক্ষা করে বললেন, "ওরা হয়তো আসবে

আজ। বাইরে বসতে ভালই লাগবে, তুমি গিরিধারীকে চেয়ারটেয়ার বাইরে দিতে বলো।"

রমলা বুঝতে পেরেছিল দেবীদাস কাদের কথা বলছেন। শীতাংশুরা আসুক না-আসুক তার কি যায় আসে! কোনো রকম আগ্রহ রমলা অনুভব করল না।

সামান্য অপেক্ষা করে দেবীদাস বললেন, "আমি হাতমুখ পরিষ্কার করে যাচ্ছি, তুমি ওদিকটায় যাও।"

রমলা যদিও দেখল না তবু বুঝতে পারল দেবীদাস চলে গেলেন। কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল। চাঁদের আলো মুখের সামনে, জালিতে আলো পড়ে ছায়া ফুটেছে, রমলা তার শাড়ির গায়ে পেনসিলের সিসের মোটা দাগের মতন অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পেল।

শীতাংশু হয়তো আসবে আজ, কিন্তু সুমিত্রা আসবে না। রমলা নিশ্চিতভাবে জানে, সুমিত্রার আসা সম্ভব নয়। দেবীদাসও কি খুশী হবেন সুমিত্রাকে দেখতে পেলে? হয়তো নয়। রমলা স্বামীর মুখ ভাল করে লক্ষ করে নি, করলে হয়তো বুঝতে পারত দেবীদাস কোনো রকম উদ্বেগ বোধ করছেন কিনা!

কোনো কোনো মানুষ থাকে যাদের বিচলিত হতে দেখলে তৃপ্তি পাওয়া যায়, দেবীদাসকে রমলা সেই রকম বিচলিত দেখার আকাঙ্ক্ষা করছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। মানুষটি অত্যন্ত সতর্ক, সাবধানী। রমলার এই অসীম বিরক্তি, নিস্পৃহতা, নিরাসক্তি তিনি শান্ত হয়ে নীরবে সহ্য করে যাচ্ছেন! কি করে করছেন রমলা বুঝতে পারে না। মনেই হয় না, দেবীদাস সংসারের এই চাপা অথচ তীব্র তিক্ত অশান্তিকে গ্রাহ্য করছেন। তিনি আগে যেমন ছিলেন তেমনি শান্ত, নির্বিকার, নীরব। যেন এ-সংসারে নতুন কিছু ঘটেছে বলে তিনি জানেন না, বা লক্ষ করেন নি। কিন্তু তা ঠিক নয়। দেবীদাস যতটা অবিচলিতের ভাব দেখান অতটা নিরুদ্বিগ্ন তিনি নেই। অথচ তা প্রকাশ করবেন না।

ঘরের দিকে দেবীদাসের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। রমলার ইচ্ছে করছিল না বাইরে গিয়ে বসতে। দেবীদাসকে উপেক্ষা করার কেমন এক স্পৃহা জাগছিল। তবু শেষ পর্যন্ত রমলা জালির সামনে থেকে সরে গেল।

মানুষ চতুর হয়। কেউ কেউ চাতুর্যের সঙ্গে সহিষ্ণুতাকে আত্মরক্ষার উপায় করে নেয়। দেবীদাস যে চতুর, এবং তাঁর সহিষ্ণুতা যে আত্মরক্ষার উপায় তাতে রমলার সন্দেহ নেই। স্বামীর এই অন্ধ সেজে থাকার ভান কেন, রমলা বুঝতে পারে। নিজেকে তিনি বাঁচাচ্ছেন।

রমলা প্যাসেজ দিয়ে রান্নাঘরের কাছে গেল, গিরিধারী এবং ঝি গল্প করছে, কথা বলতে বলতেই গিরিধারী হাতের কাজ সারছিল, ঝি এককোণে দাঁড়িয়ে। রমলা বাইরে চেয়ার পেতে দিতে বলল।

দেখতে দেখতে চাঁদের আলো ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ওদিকে জ্যোৎস্না এসে ভেসে যাচ্ছিল। রমলা সামনে তাকাল, কলাঝোপের পাতায় চাঁদের আলো রুপোর জলের মতন টলটল করছে। চারপাশ চুপচাপ। বাতাসের সরসর শব্দ হচ্ছিল মাঝে মাঝে।

রমলা হঠাৎ গভীর অন্যমনস্কতা অনুভব করল। তার যা মনে আসা উচিত তা মনে আসছিল না, যেন অদ্ভুত কোনো চিন্তার তলায় আর-এক চিন্তা, তার তলায় অন্য কোনো ভাবনা, এবং সেই ভাবনার তলায় রমলা যা চায় সেই চিন্তাটি রয়েছে। অনেকগুলি আবরণের তলায় থাকায় এই ভাবনা কুয়াশাবৃত কোনো সুদূর বস্তুর মতন অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অপরিচিত হয়ে থাকল।

ঝি ফিরে এসেছিল। সে যেন কিছু বলল, রমলা শুনতে পেল না, পরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। মনে হল, ঝি যেন বলতে চাইল দেবীদাস রমলাকে ডাকছেন।

বাইরে শর্মারা এসেছিল, শর্মা এবং চন্দ্রভান। শর্মা একেবারে

ছেলেমানুষ, তায় দেবীদাসকে দেখলে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। হয়তো দেবীদাসের পদমর্যাদা এবং বয়সটা ভুলতে পারে না। চন্দ্রভান ঠিক ছোকরা নয়, তবে বেশীরকম চঞ্চল। ওরা বোধ হয় বেশীক্ষণ থাকবে বলে আসেও নি, হয়তো কোনো পিছন টান ছিল। দেখা সেরে, তাড়াতাড়ি চা-মিষ্টি খেয়ে দেবীদাসের সামনে থেকে পালাল। দেবীদাস হেসে বললেন, হয় ভাঙ খাবে না-হয় তাস খেলতে বসবে, তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

শর্মাদের সামনে রমলা বেশীক্ষণ ছিল না; ওরা যখন চলে যাচ্ছে তখন সে এসেছিল, চন্দ্রভান ডাকাডাকি করছিল। কাছে আসতে চন্দ্রভান উঠে দাঁড়িয়ে রমলার হাতে সামান্য ক'টি শুকনো ফুলপাতা দিল, দিয়ে বলল, এ-সব প্রসাদী ফুল। ফুলের সঙ্গে কয়েকটা এলাচদানা ছিল, সামান্য আবীরের গুঁড়োও মেশানো ছিল। রমলা হাতের মুঠোয় রেখে দিল।

ওরা চলে যাবার পর দেবীদাস বললেন, "বসো; ঘরে কোনো কাজ আছে?"

রমলা কাজের কৈফিয়ৎ দিল না, কেননা সে জানে দেবীদাস কথাটা অকারণেই বলেছেন, রমলার এখন কোনো কাজ থাকার কথা নয়।

রমলা বসল। পাশাপাশি কয়েকটা বেতের চেয়ার গোল করে সাজানো, মাঝখানে বেতেরই একটা গোল টেবিল। টেবিলের ওপর শর্মাদের চায়ের কাপ, মিষ্টির প্লেট পড়েছিল। চাঁদের আলোয় চামচগুলি চকচক করছিল।

দেবীদাস সিগারেট ধরিয়ে নিলেন, বললেন, "আমাদের শীতাংশুবাবুর দেখা নেই যে!" কথাটা খুবই হালকা করে বলা, ঠাট্টা করে, এবং স্নেহবশে।

দেবীদাস কচিৎ কখনো স্ত্রীর কাছে ঠাট্টা করে ছাত্রকে শীতাংশুবাবু বলে উল্লেখ করলেও আজ যেন তিনি আরও খুশী মনে আছেন বলে

রমলার মনে হল। তাঁর কথাবার্তায় একটু বেশী হালকা ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

স্বামীর মুখ দেখল রমলা। বাগানে পূর্ণিমার আলোর মধ্যে বসে দেবীদাসকে নিজের নিকটাত্মীয়ের মতন অনুভব করতে পারল না। বরং মনে হল, খুবই বেখাপ্পা দেখাচ্ছে। দেবীদাসকে এ-সব মানায় না, হয়তো তাদের দুজনকেই এখানে মানাচ্ছে না। তারা শীতাংশু বা সুমিত্রা নয়, তাদের দাম্পত্য চিত্র এই পরিবেশে জীবন্ত ও সুন্দর হবার মতন নয়। শীতাংশুর আজ এখানে আসা উচিত নয়; সুমিত্রার হাত ধরে মাঠেঘাটে প্রান্তরে চাঁদের আলোয় তারা ঘুরে বেড়াবে—বেড়াচ্ছে, এ যেন রমলা দেখতে পেল।

দেবীদাস বললেন, "পাটনায় আমাদের মহল্লায় যে-রকম ফাগুয়া দেখতাম এখানে তার কিছুই নেই। ওসব দিকে বড় বাড়াবাড়ি করে।...একবার তো লাঠালাঠি লেগে গিয়েছিল। তুমি তখন বাঁকিপুরে এসেছ কি?"

রমলার মনে হল চুপ করে থাকে। কিন্তু আগাগোড়া কতক্ষণ সে নীরব থাকতে পারে, নিজের কানেও বিশ্রী লাগছিল। বলল, "ছিলাম।"

দেবীদাস বললেন, "থানা থেকে পুলিসটুলিস এসে গিয়েছিল, না?"

"হ্যাঁ।"

"আমার যে চাকরটা ছিল, সে-বেটাও দেখি কখন লাঠি বাগিয়ে লড়তে চলে গেছে। বেশ রাত করে বেটা ফিরল, জখম হয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে। তাকে সামলাতে আমি সারাটা রাতই প্রায় জেগে।"

রমলার ইচ্ছে হল বলে, তুমি দয়ার পুরুষ, তোমার দেবতার প্রাণ। এ-রকম দয়ামায়া মমতা আর কার আছে! রমলার মনে যে বিদ্রূপ জেগেছিল সেই বিদ্রূপ সে পুরোপুরি রোধ করতে পারল না। বলল, "তোমার মায়াদয়া বেশী।"

দেবীদাস শুনলেন কথাটা। রমলার গলার স্বর থেকে হয়তো কিছু অনুমানও করতে পারলেন, কিন্তু প্রসঙ্গটা আর তুললেন না। সামান্য নীরব থেকে বললেন, "এবারে পাটনা গিয়ে আমায় একদিন সন্ধ্যেবেলায় বাঁকিপুর যেতে হয়েছিল। সে আর চেনা যায় না; অনেক নতুন নতুন বাড়ি ঘর হয়েছে।" বলে দেবীদাস স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন, কি ভেবে বললেন, "তুমি যে-বাড়িতে থাকতে সেটা এখনও আছে।"

রমলা স্বামীর চোখ লক্ষ করল, কিছুই বোঝা যায় না। দেবীদাস কি চালাকি করে তাকে পুরোনো কথা মনে করিয়ে দিতে চাইলেন! 'তুমি তোমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ' বললে যা বোঝাত—কথাটা যেন সেই রকম। রমলা বিরক্ত হল, আহত বোধ করল। স্বামীর মুখের দিকে পলকের জন্য তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "আমাদের মতন লোকের পুরোনো যা তা থাকে।...আমার তো সবই আছে।" তার কথায় গূঢ় ইঙ্গিত ছিল, আঘাত ছিল।

রমলার গলার স্বর এত ধারালো ও তিক্ত শোনাল যে দেবীদাস কেমন অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। তিনি বুঝতে পারলেন না, তাঁর কথায় বিরক্ত হবার মতন কি ছিল! রমলার মুখে আজকাল অসুস্থতার ছাপ পড়ে যাচ্ছে, এই অসুস্থতা কতটা শারীরিক তা বোঝা যায় না, তবে মানসিক যে তা তিনি বুঝতে পারেন। স্ত্রীর মুখে এক ধরনের অসহিষ্ণুতা, বিরূপতা ও নির্দয় শত্রুতা তিনি যেন লক্ষ করছেন। রমলার সুন্দর সুশ্রী মুখে ঘৃণা ফুটলে তার রেখাগুলি এত ধারালো ও বিকৃত দেখায় যে দেবীদাসের মনে হয় রমলার স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। সে প্রকৃতিস্থ নয়।

দেবীদাস স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে ধীর ও মৃদু গলায় বললেন, "তুমি আজকাল কি রকম যেন হয়ে উঠছ দিন দিন।"

স্বামীর কথা অত্যন্ত নির্বোধের মতন শোনাল রমলার, মনে হল, যেন দেবীদাস স্ত্রীর এই পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারেন না। রমলা

বলল, "আমার রকম তোমার পছন্দ হবার কথা নয়," বলে কেমন শব্দ করল।

সত্যিই দেবীদাসের এ পছন্দ নয়। বললেন, "আমার পছন্দর কথা বাদ দিলাম, তোমারই বা এ-রকম কেন হবে!"

রমলার ধৈর্য ছিল না। বলল, "কেন হবে তুমি যদি না জানতে তোমায় বুঝতে পারতাম। জেনেও না জানার মতন তুমি ঘুমিয়ে আছ।"

হাতের সিগারেট ফেলে দিলেন দেবীদাস। তাঁর চেতনার তলায় যেন কোনো বেদনাদায়ক চিন্তা এবং দুঃখের আবর্ত পাক খাচ্ছিল। স্ত্রীর কমনীয় শ্বেত কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বিষণ্নতা অনুভব করছিলেন। দেবীদাসের মনে হচ্ছিল, রমলাকে তিনি এই কাতরতা থেকে মুক্ত করেন। এ-কথাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল, রমলার এই কাতরতা বড় দীন। স্ত্রীর দীনতা তাঁর ভাল লাগছিল না।

দেবীদাস মৃদু গলায় বললেন, "তোমাকে এ-ভাবে দেখতে আমার ভাল লাগে না। নিজেকে যত ছোট করা যায় ততই ছোট হওয়া যায়। তুমি যত ছটফট করছ, তত ছটফট না করে অন্যদিকে মন দিতে পার।" দেবীদাস যদিও কথাগুলো বললেন তবু বুঝতে পারলেন তাঁর কথাগুলো বোকার মতন হল, তিনি যা বলতে চান তা বলতে পারলেন না।

রমলা কথাগুলো শুনেছিল; বলল, "আমাকে তোমার যেভাবে দেখতে ভাল লাগে সেরকম দেখলে তুমি খুশী হও বলছ, আর আমি যেভাবে তোমায় দেখলে খুশী হব, সে-রকম তুমি হবে না?"

দেবীদাস অন্য পাশে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। রমলা যা বলতে চাইল তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন। কিন্তু এ-কথা তিনি বুঝতে পারলেন না, রমলা তাঁকে কিভাবে দেখতে চায়। অজ্ঞান, হীন, উন্মত্ত কোনো মানুষের মতন? সে দেবীদাসকে জানতে চায়। যা জানতে চায় তা জানলে ওর কি এমন শান্তি হবে! খুব সাধারণ

কৌতূহল নিরসন ছাড়া রমলার আর কিছু হবে না; সে উপকৃত বা লাভবান হবে না। তুমি শুধু তোমার মনের কৌতূহল চরিতার্থ করবে, আমায় বুঝবে না—বোঝা সম্ভব হবে না। তাছাড়া, আমাদের প্রত্যেকের জীবন হয়তো আলাদা, কিন্তু তবু কোনো কোনো সময় কিছু বাঁচাতে হয়, নিজের জন্যে, অন্যের জন্যে। অন্তত এখন পর্যন্ত আমি মনে করছি, অন্যের সম্ভ্রম ও সুখ নষ্ট না করার জন্যে নিজেকে কিছু সহ্য করতে হয়।

দেবীদাস আকাশের দিকে চোখ তুলে অনেকক্ষণ যেন নিজেকে কিছু বোঝালেন, নিজের চিন্তা সংযত ও স্থির করলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "তোমায় আমি আগেও বলেছি, তুমি নিজেকে অকারণে বেশী রকম কষ্ট দিচ্ছ।" বলে নীরব হয়ে গেলেন।

রমলা বুঝতে পারল, দেবীদাস আর এ-প্রসঙ্গে কথা বলবেন না। ওই রকমই ওঁর চরিত্র। যখন বোঝেন আর কথা বলা উচিত নয় তখন এমন করে তাঁর কথা শেষ করে দেন যে বেশ বোঝা যায়, তিনি আর প্রসঙ্গটা পছন্দ করছেন না।

রমলাও নীরবে বসে থাকল। দোল পূর্ণিমার অফুরন্ত জ্যোৎস্না এবং এই নির্জনতা ও নিভৃতি, চৈত্রের বাতাস, স্বামীসঙ্গ—সমস্তই তার দাম্পত্য জীবনকে যেন শবানুগমনের মতন অনুগমন করছিল।

পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মধ্যে বসে থাকতে থাকতে যখন আর সহ্য হল না, রমলা উঠে দাঁড়াল। তার দাঁড়াবার শব্দে দেবীদাস যেন চেতনা পেলেন, বললেন, "শীতাংশু তো এল না এখনও?"

রমলার ইচ্ছে হল বলে, সে এল না বলে তুমি কি যেতে পার না? যাও না। না কি সুমিত্রার কাছে যেতে চাও না?

বাগান থেকে ঘরের দিকে আসার সময় রমলা ফুলগাছের ঝোপের কাছে হঠাৎ দাঁড়াল, তারপর ভাবল, শীতাংশু যদি না আসে আর রমলা খুশী হবে।

১০

দিনগুলি সহ্যাতীত হয়ে উঠেছিল।

বৈশাখ এমন করে এল, যেন তার ভীষণ রুক্ষতার কোথাও একটু মমতা নেই। আকাশ মাটি পুড়ছিল, আগুনে রোদে ঝলসে যাচ্ছিল চতুর্দিক। মাঠের মরা বুকের ওপর আঁচ উঠছে, প্রতিফলিত রৌদ্রকণাগুলি এত তপ্ত যে, তরঙ্গের মতন ঝলসানি উঠছিল; বৃক্ষ ও তৃণগুলি ক্রমাগত এই দাহের জ্বালা সহ্য করে করে শুষ্ক হয়ে আসছে; পাখিগুলি ছায়ার খোঁজে কোন সকালে বুঝি অরণ্যের দিকে চলে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে। খুব সকালে, যখন সারা রাতের আঁধার কেটে ভোরের আলো ফুটছে তখন যেটুকু স্নিগ্ধতা, বাতাস তখন শীতল ও মনোরম থাকে, তার পরেই অন্য মূর্তি ধরে রৌদ্র দেখা দেয়, আকাশ অবিকল এক চিতার মত জ্বলে ওঠে। সামান্য বেলা থেকেই লু, দেখতে দেখতে খাঁ-খাঁ মাঠঘাট ডিঙিয়ে ঝোড়ো বাতাসের মতন গরম হাওয়ার ঝাপটা ক্রমাগত বয়ে যায়; শব্দ থাকে, এবং এই ভ্রূক্ষেপহীন বৈশাখের চেহারা দেখে মনে হয় না কোনো কালে আবার কিছু শীতলতা অনুভব করা যাবে।

দুঃসহ জ্বালার মধ্যেই দিনগুলি কাটছিল। সুমিত্রাদের কোয়ার্টারের দিকে তাদের কুয়ার জল শুকিয়ে প্রায় কাদা উঠছিল; রমলাদের বাড়ির কুয়াও শুকিয়ে এসেছে। বয়েল গাড়ি করে খাবার জল আসছিল পাহাড়ের কোন শীর্ণ ঝরনা থেকে। ঘোলাটে অব্যবহার্য জলের মতন এখানের জীবনও যেন অসহ হয়ে উঠছিল এই ক'টি মানুষের। তৃপ্তি না, শান্তি না, শীতলতা নয়, শুধু দাহ আর জ্বালা।

সুমিত্রা ছটফট করছিল, ক্ষয়ে যাচ্ছিল, এবং দিন দিন তার লাবণ্য

যেন মরে যাচ্ছিল। শীতাংশু কেন যেন, ইদানীং স্ত্রীর অসহিষ্ণুতায় খুব সহজেই বিরক্ত হয়ে উঠছিল। সব মানুষই যা সয়ে নিচ্ছে, য তাদের কাছে স্বাভাবিক কষ্ট, সুমিত্রা কেন তা সয়ে নেবে না। শীতাংশু সুমিত্রার ধৈর্যহীনতা বুঝতে পারছিল না। তুমি তো সারা দিন ঘর বন্ধ করে বসে আছ, বাইরের অবস্থা যেমনই হোক কি আসে যায় তোমার। আমরা চাকরি করছি না? টা-টা রোদে লু খেতে খেতে অফিসে ছুটছি না? নাকি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তোমার মতন সারাক্ষণ ছটফট করছি, সমস্ত সময় এই জায়গাটার খুঁত ধরছি 'তোমার হয়েছে সেই অবস্থা, যাকে দেখতে পারি না, তার চলনও বাঁকা। এই জায়গাটাই তোমার চোখে বিষ হয়ে উঠেছে।'

শীতাংশু ইদানীং কোনো কোনো সময় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠত। সুমিত্রা হাজারো রকমের খুঁত ধরছে এখানের। যে-সব খুঁত অন্য কোথাও সে আগে গ্রাহ্য করে নি, করার মতনই নয়, এখানে সেইগুলো সারা দিন তার মাথায় ঘুরছে। সব দিক দিয়ে মনের মতন হবে এমন জায়গা জগতে থাকে না, কিছু সুখ কিছু সুবিধের মতন কিছু অসুবিধে কিছু অভাব কোন জায়গায় না থাকবে! তা ছাড়া এটা চাকরির জায়গা, নিজের ঘরবাড়ি নয়।

আসল কথাটা ওই—জায়গাটাকে চোখের বিষ করে নিয়েছে সুমিত্রা, দেবীদাস এবং রমলাদির জন্যে এ জায়গার সবই তার অসহ্য শীতাংশু এক একদিন রীতিমত রেগে উঠতে শুরু করেছিল, শুধুমাত্র তার জন্য এমন একটা বিশ্রী অবস্থা হয়ে উঠল যে, এখন দেবীদাসকে দেখলেই শীতাংশুর মনে হয়, হয়তো উনি রমলাদির কাছ থেকে জেনে ফেলেছেন সব। কি ভাবছেন উনি? ভাবছেন, এই তাঁর স্নেহের ছাত্র, যাকে দয়া করে মনে রেখে নিজের কাছে এনে ভাল চাকরিতে বসিয়েছেন, যাকে দ্বিধা না করে নিজের বাড়িতে আত্মীয়ের মতন আসা-যাওয়া করতে দিয়েছেন। মানুষ কত বড় অকৃতজ্ঞ হলে এ-রকম নোংরা কাজ করে!

সে দিনের ঘটনার পর ও-বাড়িতেও খুব কম গেছে শীতাংশু।

শেষ গিয়েছিল দোলের দিন। সে-দিনের যাওয়া স্বাভাবিক হয় নি, ওই অবস্থায় তার যাওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু তখন তার বোধবুদ্ধি বোধ হয় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, শীতাংশু ভাবতেই পারে নি ওই রকম একটা অবস্থা হবে।

দোষ সুমিত্রার। সুমিত্রা তাকে ভীষণ রাগিয়ে দিয়েছিল। বরাবর যেমন করে আসছে, রমলাদির বাড়িতে যাবার কথা উঠতেই মুখ ফিরিয়ে নিল। অন্যদিন হলে অপ্রসন্নতা সত্ত্বেও শীতাংশু হয়তো চুপ করে যেত, কিংবা স্বামীস্ত্রীতে দুটো কথা-কাটাকাটি, সামান্য মনোমালিন্য হত, তারপর আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যেত এক সময়। আজকাল আর অনর্থক অশান্তি করতে চায় না শীতাংশু, তার সয়ে আসছে ক্রমশ। দোলের দিন বলেই শীতাংশু স্ত্রীর ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল।

"যাবে না?"

"উ-হু! না।" সুমিত্রা মাথা নাড়ল শক্ত করে, কোনো রকম লুকোচুরি নেই, একেবারে অকপট।

অসন্তুষ্ট হল শীতাংশু, সুমিত্রাকে ভীষণ উদ্ধত মনে হল। শীতাংশু বলল, "তুমি সাধারণ সামাজিকতা রাখতে ভুলে গেছ। আজ দোল পূর্ণিমা, আমাদের একবার ও-বাড়ি যাওয়া উচিত।"

"তুমি যাও, দোল খেলে এস।"

সুমিত্রার বলার ভঙ্গি, গলার স্বর, ঠোঁট-মুখের চেহারা শীতাংশুর অসহ্য লাগল। মনে হল, সুমিত্রা শুধু অসভ্যতা করছে না, ইতরতা প্রকাশ করছে। মাথা আরও গরম হয়ে উঠল শীতাংশুর, বলল, "তুমি ভীষণ 'মীন' হয়ে গেছ! ভদ্র পরিবার সম্পর্কে কথা বলার শিক্ষাও ভুলে গেছ।"

অপমান এবং তিরস্কারটা গায়ে লাগল সুমিত্রার, রেগে আগুন হল। তারপর রাগারাগির মাথায় স্বামীস্ত্রীতে কি যে বলল আর না-বলল তার ঠিক নেই। সেদিন যে রকম বচসা হল তার চেয়ে

ঝগড়া ভাল। আগে কখনও ওদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে তিক্ত ইতর কলহ হয় নি, সেদিন যথেষ্ট তিক্ততার সঞ্চার হল। শীতাংশু স্ত্রীর প্রতি এত বেশী অসন্তুষ্ট হয়েছিল যে, ভীষণ বিতৃষ্ণা তিক্ততা ও বিরূপতা নিয়ে উত্তেজিত মনে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা শর্মাদের আড্ডায়। একা আজ কিছুতেই শীতাংশু রমলাদিদের বাড়ি যাবে না। সমস্ত জিনিসের একটা মাত্রা আছে, চোখের ভালমন্দ আছে। আজ তার একা একা ও-বাড়ি যাওয়া দৃষ্টিকটু দেখাবে। সুমিত্রার না-যাওয়ার কারণটা এত বেশী অনাবৃত ও কুৎসিত হয়ে প্রকাশ পাবে যে দেবীদাস ও রমলাদি কিছু জিজ্ঞেস না করলেও সকলেই সেই বিশ্রী অস্বস্তি ভোগ করবেন।

শর্মাদের আড্ডায় যাবার কথা আগে থেকেই ঠিক ছিল। শীতাংশু বলেছিল, দেবীদাসদের বাড়ি থেকে ফিরে সে চলে আসবে। একটু রাত হতে পারে। কিন্তু সন্ধ্যে-সন্ধ্যেয় হাজির হল শীতাংশু শর্মাদের কাছে। ওরা তখন সবে আসর পেতে বসেছে দেবীদাসের বাড়ি থেকে ফিরে এসে। চন্দ্রভান জিজ্ঞেস করল, গুহসাহেবের বাড়ি থেকে এত জলদি ফিরে এলে? শীতাংশু কোনো উচ্চবাচ্য করল না।

শর্মাদের সঙ্গে বসে শীতাংশু একেবারে ওদের মতন হয়ে গেল ভাঙের সরবত খেল কয়েক গ্লাস, কি-রকমের এক নেশা লাগল খানিকটা বেপরোয়া হয়ে ফাগুয়ার হুল্লোড়ে মাতল, তে-তাস চলতে লাগল বাজী ফেলে, সিগারেট পুড়তে লাগল, এবং সেই অবস্থায় চন্দ্রভানের কথায় আরও কি যেন খেয়ে ফেলল ভাঙের সরবত মনে করে। সেটা ঠিক সিদ্ধির সরবত নয়, চন্দ্রভানের নিজের হাতে তৈরী কোনো রকম নেশা, সিদ্ধির সঙ্গে মেশানো।

মনের রাগ, অসন্তোষ, জ্বালা, উচিত-অনুচিত বোধ আস্তে আস্তে কোথায় যেন তলিয়ে গেল। এবং ক্রমে নিজেকে খুব হালকা ফুরফুরে লাগছিল, চমৎকার মনে হচ্ছিল সব, মজা লাগছিল, কথায় কথায় শীতাংশু হোহো করে হাসছিল। পকেটে টাকা ছিল না, চন্দ্রভানের

কাছে টাকা ধার করে খেলতে বসেছিল শীতাংশু, পকেট শূন্য হলে উঠে পড়ল।

বাইরে আসতে তার রমলাদির কথা মনে পড়ল, দোল পূর্ণিমার চাঁদের আলো দেখে তার কেমন বিহ্বল ভাব জাগল। এবং ওই অবস্থায় সে রমলাদির বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

রাত তখন কিছু কম নয়। শীতাংশুর সেটা খেয়াল হয় নি, হবার কথাও নয়। রমলাদিদের বাড়িব কাছে আসতেই মনে হল, বাতিটাতি জ্বলছে না যেন কোথাও। ফটকের সামনে এসে দাঁড়াতে বারান্দার তলায় বাগানের কাছটায় রমলাদিকে দেখা গেল।

রমলাদি ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে শীতাংশুর হঠাৎ খেয়াল হল, তাব বেশ নেশা রয়েছে। এ-অবস্থায় তার এ-বাড়িতে ঢোকা উচিত নয়, পালিয়ে যাওয়া উচিত। মাস্টারমশাই যদি এসে পড়েন বিশ্রী একটা কাণ্ড হবে।

শীতাংশু পালাতে পারল না, রমলা ফটকের কাছে এসে গিয়েছিল।

রমলাকে দেখে শীতাংশু কথা বলতে পারল না, কিন্তু হেসে উঠল জোরে। হাসিটা একেবারে হালকা, এলোমেলো। কিন্তু স্বাভাবিক নয়।

রমলা বুঝতে পারে নি প্রথমে, বলল, “এতটা রাত করে···”

শীতাংশু হাসির গলায় বলল, “কোথায় রাত! মার্ভেলাস পূর্ণিমা।···মাস্টারমশাই কোথায়?”

“খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে গেলেন।” রমলা শীতাংশুকে লক্ষ করছিল।

“এরই মধ্যে!···মাস্টারমশাইকে······ক’টা বেজেছে?”

“তা দশটা প্রায়।”

“দশটা!···এর মধ্যে দশটা!···মনেই হচ্ছে না, না? আপনি শুতে যান নি?”

“এই একটু পায়চারি করছিলাম।”

“আজ ঘুরে বেড়াবার মতন রাত্তির···ঘুম আসা মুশকিল!”

রমলার অবাক লাগছিল। শীতাংশু তুহাতে গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সে ভেতরে আসতে চায় না, চলে যেতেও নয়। তার কথাবার্তাও কেমন যেন অগুছোলো, তরল। কথায় কথায় হাসছে, চোখমুখ কেমন জড়ানো।

রমলা বলল, "আপনারা আজ এলেন না!"

শীতাংশু তু মুহূর্ত রমলার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল, "সুমিত্রা : সুমিত্রা এল না।...সুমিত্রা বড় 'মীন'। বুঝলেন রমলাদি, সুমিত্র এবাড়িতে আসবে না, কখনও না। মাস্টারমশাইয়ের ওপর তা ভীষণ রাগ! ওর কোনো রেসপেক্ট নেই আপনাদের ওপর।...কে এ-রকম করে আমি জানি না। তার দিদির সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ে কি হয়েছে তা জেনে আমার লাভ কি!"

রমলা শীতাংশুর উত্তেজনা লক্ষ করল, অনুভব করল শীতাংশু কেমন ক্ষুব্ধ, আহত। তার মনে হল, শীতাংশু তেমন স্বাভাবিক অবস্থায় নেই

"বাড়িতে বুঝি ঝগড়া করেছেন?" রমলা অনেক কষ্টে নিজেবে সামলে স্বাভাবিক হালকা হতে চাইল।

"না, মানে..., হয়ে গেল," শীতাংশু ইতস্তত করে বলল, "আমি এ-সব ভালবাসি না। এ-বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক নষ্ট করা কোনো কারণ নেই। আছে? আপনি বলুন?...সুমিত্রার জন্যে আমার আসা-যাওয়া বন্ধ করতে হবে?"

রমলা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না, পরে বলল, "আমি বি বলব!...আপনি আসতে চাইলেই আসবেন।"

শীতাংশু বোকার মতন, কিছু না ভেবেই রমলার হাত ধরে ফেলল রমলা গেটের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলেমানুষের মতন বলল "আপনাদেব আমার খুব ভাল লাগে, রমলাদি। আমি এ-বাড়ি থেকে কি না পেয়েছি—! এ-সব নষ্ট করতে আমার ইচ্ছে করে না।"

রমলা সামান্য সময় অসাড় হয়ে থাকল, তার চোখের পাত মাটির দিকে। তারপর আস্তে করে হাত সরিয়ে নিল।

শীতাংশু তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নিল, বুঝতে পারল সে রমলার হাত ধরে ফেলেছিল।

কোনো রকমে রমলা বলল, "রাত হচ্ছে···! বাড়ি যাবেন না?"

শীতাংশুর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করল না সে-মুহূর্তে। রমলাকে সহসা তার অনেক কথা বলার ইচ্ছে হল। রমলার শান্ত বিষণ্ণ অসামান্য মূর্তির দিকে তাকিয়ে শীতাংশু মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। শেষে খেয়াল হল যখন, তখন দেখল রমলা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। বলল, "আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম। আচ্ছা, চলি···।"

রমলা আর মুখ উঠিয়ে তাকাল না।

পরে শীতাংশুর মনে হয়েছিল ঝোঁকের মাথায় সে এমন ক'টা কাজ করেছে যা অন্যায়। হয়তো ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর জীবনের অশান্তিকে সে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, রমলাদি তার কাছ থেকে যেটুকু আগে জেনেছিলেন সেদিন যেন তার কথায় আরও বেশী করে কিছু বুঝতে পেরেছেন। উনি ওইটুকুতে সন্তুষ্ট থাকবেন এমন মনে হয় না, তিনি তারপর আর যে কি জানছেন বা জেনে ফেলেছেন তাই বা কে জানে? কি হবে শীতাংশুর যদি হঠাৎ একদিন দেবীদাস তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি তোমায় এখানে আমার পারিবারিক জীবনের শান্তি নষ্ট করতে এনেছিলাম?'

মনে মনে এই অশান্তি এবং অস্বস্তির মধ্যে ছিল বলেই শীতাংশু নিজেকে দেবীদাস এবং রমলার কাছ থেকে যথাসাধ্য আড়ালে সরিয়ে নিয়েছিল। অফিসে দেবীদাসকে এড়াত, রমলাকে এড়াত ও-বাড়ি না গিয়ে; এবং বাড়িতেও সুমিত্রাকে একটু তফাতে রাখার জন্যে সন্ধ্যেবেলায় শর্মার কোয়ার্টারে চলে যেত তাস খেলতে।

কখনও কখনও তার মনে অন্য ধরনের চিন্তাও আসত। দেবীদাসের সঙ্গে সুমিত্রার কোনো সম্পর্কের কথা সে ভাবতে শুরু করেছিল হঠাৎ। কিন্তু চিন্তাটা বিশ্রী এবং ইতর বলে সে তা আমল দিতে চাইত না। এ

অসম্ভব। প্রথমত দেবীদাসের বয়স তখন এমন কিছু কম না, বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, স্বভাব নিষ্কলুষ, জ্ঞানবুদ্ধি যথেষ্ট, তা ছাড়া তিনি অঞ্জুদিকে ভালবাসতেন; নিতান্ত ষোলো সতেরো বছরের একটি কিশোরী, বা সবে যে কিশোরী-বয়স পেরিয়েছে, ছেলেমানুষ একেবারেই অপরিণত—তেমন মেয়ের সঙ্গে কি সম্পর্কই বা গ‍ে তুলতে পারেন! স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক ছাড়া এখানে আর কিছু গড় যায় না, অন্তত দেবীদাসের মতন মানুষ কখনোই নিজের মান মর্যাদ বয়স বিবেক ভুলে এমন কিছু করবেন না যা লজ্জার ও গ্লানির।

এ-সব কথা শীতাংশুর যখনই মনে পড়েছে সে নিজের কাছে নিজেই কুণ্ঠিত হয়েছে। ধিক্কার দিয়েছে নিজেকেই। কি করে সে নিজের স্ত্রী এবং দেবীদাসের মতন শ্রদ্ধার মানুষকে নিয়ে সে এই ধরনের নোংরা কথা ভাবতে পারছে? শীতাংশু লজ্জিত বোধ করছে মনের এই হীনতা তাকে পীড়িত করেছে।

শীতাংশু এমনও ভেবেছে, সুমিত্রার চরিত্রে ওই অদ্ভুত ধরনে একটা পাগলামিই তার চিন্তার কারণ কেন হবে! পারিবারিক জীবনে সুমিত্রার কাছে না পাওয়া যায় এমন কিছু নেই। শীতাংশু বলতে পারবে না কখনও, সুমিত্রা আমার স্ত্রীর পক্ষে যা দেয় তার কিছু অদেয় রেখেছে! শীতাংশু নিজের মনকে বলত: আজ ছ বছর ধরে আমি সুমিত্রাকে চিনি। ভালবাসা কাকে বলে আমি জানি না কিন্তু যদি সুমিত্রার এই মায়া, মমতা, ঘনিষ্ঠতা, সান্নিধ্য, একাত্মতা ভালবাসা না হয়—তবে আমি অন্য কোনো ভালবাসায় বিশ্বাস করি না গ্রাহ্যও করি না। আমার কাছে এই ভালবাসাই যথেষ্ট, যথেষ্ট।

একদিন স্ত্রীর প্রতি নিবিড় মমতা অনুভব করে শীতাংশু বলল "তুমি অশান্তি নিয়ে থাক, আমার তা ভাল লাগে না, তুমি।...এই জায়গা ছেড়ে চলে গেলেই যদি তুমি বাঁচো, তবে শেষ পর্যন্ত তাই যেতে হবে। কিন্তু আমার দুঃখ থাকবে..."

সুমিত্রা প্রশ্ন করে নি কিসের দুঃখ। শীতাংশু নিজেই বলেছিল

"চলে যাবার চেষ্টা করলে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু চলে যাবার চেয়ে বড় কথা, কেন চলে গেলাম আমি তা জানব না। মাস্টারমশাইকে আমি কোনো কালে কিছু দিতে পারব না, এক যা সম্মান আর শ্রদ্ধা।...জগতে সৎ সজ্জন সহৃদয় মানুষ আজকাল অনেক কমে এসেছে, আমরা ভাগ্যবশে এক-আধজনকে দেখতে পাই। মাস্টারমশাই তেমন মানুষ, আমি তাঁকে নীচুতে নামাতে পারব না, সে তুমি যাই বলো, যতই বলো।...যদি আমি এখান থেকে চলে যাই, নিজের থেকে, তবে আমি জানব, আমি একটা অন্যায় করলাম। হয়তো সরাসরি অন্যায় নয়, তবু অন্যায়..."

সুমিত্রা ভেবেছিল চুপ করে থাকবে, বলবে না যে, মানুষে মুখে যত বড় বড় কথা বলে, মনে তা বলে না। তবু সুমিত্রা বলল, "তোমার মাস্টারমশাইয়ের মান-মর্যাদা বেশী, না আমার? বিশ্বাস তুমি কাকে বেশী করো, ওঁকে না আমাকে?"

"ছেলেমানুষের মতন কথা বলছ। এখানে ও-সব কথা আসে না।"

"আসবে না কেন, আসে। যাকগে, যদি তোমার ন্যায় করার ইচ্ছে থাকে, তুমি এখানেই থাক, আমি কিছু বলব না আর। কিন্তু আমি বলে রাখছি, তোমার মাস্টারমশাইকে তুমি যা ভাব তা তিনি নন।"

শীতাংশু একটা কথা এখন স্বীকার করে। দেবীদাস যত বড় মানুষই হোন, তিনি অন্তত এক জায়গায় সহৃদয় নন; রমলাদির কাছে। স্ত্রীর কাছে দেবীদাস যে খুব কাছের মানুষ নন, হৃদয়ের সম্পর্ক যে ওঁদের নিবিড় নয়, অন্তরঙ্গ নয়, শীতাংশু এখন তা অনুভব করতে পারে। সে এবং সুমিত্রা যেমন, দেবীদাস এবং রমলা তেমন নন। তাদের বয়স অনেক কম বলে, এবং স্বভাব অন্য রকম বলেই যে এই রকম একাত্ম সম্পর্ক তা নয়, তারা স্বামী-স্ত্রী, সাধারণ মানুষের মতনই একে অন্যকে আশ্রয় করে, এ ওকে পূরণ করে, ভালবেসে বেঁচে আছে। দেবীদাস এবং রমলাদি তাঁদের বয়সের মতন করে এবং

স্বভাব মতনও পরস্পরকে গ্রহণ করেছেন কি? মনে হয় না করেছেন। ওঁদের সম্পর্ক কেমন আড়ষ্ট, বিচ্ছিন্ন; সুন্দর স্বাদ বা সৌরভ নেই, প্রাণহীন। রমলাদি যে সুখী নন, তাঁর মুখ যে কত বিষণ্ণ, এবং তিনি যে নিরন্তর এক বেদনার মধ্যে রয়েছেন, শীতাংশু এখন অক্লেশে তা অনুভব করতে পারে। দেবীদাস এবং রমলাদির জন্যে সে সত্যিই দুঃখ বোধ করে। সে জানে না, কেন ওঁরা এমনভাবে সংসারে বেঁচে আছেন! দেবীদাসের মতন স্বামী সত্ত্বেও রমলাদি অসুখী, রমলাদির মতন স্ত্রী সত্ত্বেও দেবীদাস নিস্পৃহ! আশ্চর্য!

১১

দেবীদাস স্বপ্ন দেখছিলেনঃ স্বপ্ন দেখছিলেন, তিনি দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছেন। তাঁর খুব পরিচিত চেহারাটা একটা বড় কাঁচের বাক্সের মধ্যে দাঁড় করানো, এবং তিনি আর-এক দেবীদাস ওই কাঁচের বাক্সর চেহারার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে চলে যেতে যেতে হঠাৎ কার ডাকে মুখ ফেরাতেই বাক্সর মধ্যে নিজের অবিকল মূর্তি দেখতে পেলেন। প্রথমে মনে হল, কোনো বড় আয়নার মুখোমুখি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। কোথা থেকে যেন হালকা আলো আসছিল, পরিষ্কার নিজের চেহারা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। নিজের মুখ দেখতে কেন যেন ভাল লাগছিল দেবীদাসের, বয়সের সমস্ত ছাপ ফুটে আছে মুখে, মস্ত কপাল, সাদা অল্প কিছু চুল মাথায়, দাড়ি কামানো পরিচ্ছন্ন গাল, চামড়া একটু আলগা, লম্বা নাকের ডগা ঈষৎ ফুলে আছে, চিবুকের একপাশে একটি ছোট জড়ুল।...যেভাবে মানুষ কখনও কখনও নিজের ওপর প্রসন্ন হয়ে সায়-দেওয়া সকৌতুক হাসি হাসে, দেবীদাস সেই রকম করে একটু হাসলেন; কিন্তু আয়নার দেবীদাস হাসল না। এই ঘটনা তাঁকে বিস্মিত করল, তিনি একটু নড়লেন, অন্য দিকের দেবীদাস স্থির হয়ে থাকল। সামান্যক্ষণ যেন বিমূঢ় থাকার পর দেবীদাস কয়েক পা পিছিয়ে আসতেই তাঁর খেয়াল হল, তিনি যাকে দেখলেন সেই মূর্তি আয়নায় প্রতিফলিত দেবীদাস নয়।...কৌতূহল বোধ করলেন দেবীদাস, এবং কিছুটা মনোযোগ দিয়ে দেখার পর বুঝতে পারলেন, কাঁচের বাক্সে তাঁকে কেউ দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ওই কাঠামো থেকে তিনি কি করে বেরিয়ে এসেছেন—বুঝতে পারলেন না, কিন্তু কৌতুক বোধ করলেন। কোনো যাদুকরের খেলা দেখছেন মনে হল। অল্প সময় দাঁড়িয়ে থাকার পর তিনি মুখ ফেরালেন এবং সোজা

হাঁটতে লাগলেন। হাঁটার পথে তাঁর মনে হল, শরীর বেশ হালকা লাগছে, জোরে জোরে তিনি হাঁটছেন, যেন ছুটে চলেছেন। এ-বয়সে দিব্য এক ছোকরার মতন তিনি কিভাবে ছুটতে পারছেন বুঝতে পারলেন না, কিন্তু তাঁর পছন্দ হচ্ছিল, বেশ আনন্দ পাচ্ছিলেন।··· যেতে যেতে দেখলেন এক গলিতে এসেছেন ; গলির পর ট্রাম রাস্তা। ট্রাম রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। কে যেন সারা গায়ে আগুন নিয়ে ট্রাম থেকে নেমে আসছে। সে জ্বলছিল, তার পোশাক-আশাক দেহ মুখ মাথা জ্বলছিল। দেবীদাস এগিয়ে যাবেন কিনা ভাবছেন, তাঁর গায়ের পাশ দিয়ে সেই জ্বলন্ত চেহারাটি চলে যেতে যেতে তাঁকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। দেবীদাসের গা জ্বলল, কিন্তু অদ্ভুতভাবে জ্বলছিল যেন, তিনি গায়ের চামড়া মাংস রক্ত, বুক, চোখ, মাথা, মুখ সবই জ্বলতে দেখলেন, অথচ কোনো শিখা বা ধোঁয়া দেখলেন না। প্রচণ্ড একটি দাহ তাঁর শরীরকে জ্বালাচ্ছিল, তিনি কাঁপছিলেন, তাঁর নিশ্বাস পুড়ে যাচ্ছিল, বুকে শব্দ হচ্ছিল—এবং সহসা দেবীদাস অনুভব করলেন তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গেল।···এরপর, যদিও আর দেখতে পেলেন না দেবীদাস, বুঝতে পারলেন, যে-যাদুকর তাঁকে খেলাচ্ছিল, তাঁকে বাইরে বের করে দিয়েছিল. সেই যাদুকর দেবীদাসকে আবার যথারীতি কাঁচের বাক্সে ঢুকিয়ে অন্য দেবীদাসের খোলসের মধ্যে পুরে দিল। হাততালি দেবার জন্যে একটিমাত্র দর্শক। রমলা।

ঘুম ভেঙে গেল দেবীদাসের। চোখ মেলে দেখলেন, তিনি ঘরে, বিছানায়। ঘুম ভেঙে গেছে অনুভব করেও তাঁর উদ্বেগ দূর হল না। বিশ্রী অস্বস্তি এবং ক্লান্তি লাগছিল। শরীরে যথেষ্ট ঘাম হয়েছে। ঘরের পাখা চলছিল—এবং একটি স্থায়ী মৃদু শব্দ ছিল। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে শুয়ে থাকার পর অস্বস্তিবশত তিনি বিছানায় উঠে বসলেন, তাঁর গলা শুকনো, পিপাসা পেয়েছে।

জানলার কাছেই জল ছিল। জল খেয়ে অনেকটা স্বস্তি পাওয়া গেল, স্বাভাবিকভাবে দেবীদাস নিশ্বাস নিতে পারলেন। বাইরে

প্লাবিত জ্যোৎস্না। দেবীদাস বালিশের তলা থেকে সিগারেটকেস ও লাইটার উঠিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরালেন। অদ্ভুত স্বপ্নটি তখনও অন্ধ মাছির মত তাঁর চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল, বিরক্ত করছিল। দেবীদাস অস্বুবিধে বোধ করছিলেন। রমলা পাশে নেই, থাকলে হয়তো এতটা খারাপ লাগত না, বা এই অস্বস্তি কাটাবার জন্যে তিনি রমলাকে ডাকতে পারতেন।

কয়েক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া গলা এবং বুকে টেনে নেবার পরও তাঁর এই বিশ্রী অস্বস্তি কাটল না, বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। চটিটা পায়ে গলিয়ে আস্তে আস্তে তিনি বাইরে এলেন, বারান্দায়; বারান্দায় নেয়ারের খাটের চারপাশে সাদা ধবধবে মশারি, বাতাসে মশারির গা এবং চাল অনবরত কাঁপছিল, মনে হচ্ছিল কে যেন রমলাকে মশারি তুলে খোঁজবার চেষ্টা করছে।

নেয়ারের খাটের কাছে এসে দেবীদাস দাঁড়ালেন, অল্প করে ধোঁয়া নিলেন গলায়, কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর ডাকলেন, "রমলা।"

সাড়া এল না। দেবীদাস আবার ডাকলেন, কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

মাথার দিকে মশারি তুলে দেবীদাস ঘুমন্ত রমলাকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে গিয়ে দেখলেন, বিছানা শূন্য, রমলা নেই, সে চলে যাবার সময় পায়ের দিকের মশারি অতি অযত্নে তুলে দিয়ে গেছে বলে বাতাসে এলোমেলো হয়ে মশারির জাল উড়ছে। দেবীদাস ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন হঠাৎ।

রমলা বাথরুমে গেছে ভেবে তিনি সামান্য সময় অপেক্ষা করলেন, তাঁর বুক ধকধক করছিল; রমলা আসছে না দেখে দেবীদাস শোবার ঘরের কাছে এলেন এবং বাথরুমের দিকে তাকালেন, আলোর একটি রেখাও দরজা দিয়ে আসছিল না।

ভীত এবং আতঙ্কিত হয়ে দেবীদাস আবার বাইরে এলেন, বিছানা পেরিয়ে সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়ে সামনে তাকালেন। আদিগন্ত

জ্যোৎস্নার প্লাবন। সেই জ্যোৎস্নায় দেবীদাস দেখলেন, বাড়ির গেট-এর ওপারে রাস্তা থেকে নেমে মাঠে রমলা দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে যেন তাঁর বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্বাস সামান্য পড়ল।

সামান্য কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে বাগানে নামলেন দেবীদাস; বাগানে নেমে সরু পথে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি দূরে জ্যোৎস্নায় রমলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছিলেন। দৃশ্যটি তাঁর কাছে অপ্রাকৃতের মতন লাগছিল। আকাশে পূর্ণ চাঁদ, বৈশাখের নির্মেঘ শূন্যতা থেকে উচ্ছলিত কিরণ এসে পড়েছে; রাত্রি বুঝি মধ্য প্রহর; নিস্তব্ধ, নির্জন ও নিদ্রিত এই চরাচরে ধবল জোৎস্নার মধ্যে রমলাকে বড় একাকিনী ও করুণ লাগছিল। দেবীদাসের মনে যে উৎকণ্ঠা জেগেছিল সামান্য আগে, এখন তা অনেকটা কমে এসেছে, তবু তিনি স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না।

ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালেন দেবীদাস, ফটক হাট করে খোলা, কিছু দূরে রমলা। রমলা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর পা পা করে হাঁটছিল, তার মুখ দেবীদাসের দিকে না থাকায় সে দেবীদাসকে দেখতে পেল না। দেবীদাসের মনে হল, রমলা কেমন এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে, আচ্ছন্নতার মধ্যে; দেবীদাসকে যদিবা এ সময় সে দেখে তবু চিনতে পারবে না হয়তো। হাতের সিগারেট ফেলে দিলেন দেবীদাস।

রমলা মুখ নীচু করল, সে কোনো দিকে নজর করছিল না, যেন নিশির ঘোরে মাঠের মধ্যে হাঁটছিল।

দেবীদাস দেখলেন, রমলার গায়ের শাড়িটা সাদা, হয়তো পাড়ের কাছে ফিকে কোনো রঙের সরু টেপ্ আছে, সেই বিবর্ণ রঙ দেখা যাচ্ছিল না এখন। পায়ের কাপড়, পিঠের আঁচল বাতাসে উড়ছিল।

দেবীদাস বুঝতে পারলেন না, রমলা আজকাল রোজই রাত্রে এভাবে বাইরে চলে আসে কি না! হয়তো আসে, হয়তো আজই

এসেছে। কেন এসেছে দেবীদাস তাও জানেন, কিন্তু জানেন না রমলা একা একা কোথায় যেতে চায়!

ধীর পায়ে রমলার পিছনে এসে দাঁড়ালেন দেবীদাস। সামান্য ইতস্তত করে ডাকলেন, "রমলা।"

রমলা যেন কানে শুনতে পেল না, তার খেয়ালে এল না। হাওয়ায় তার পিঠের আঁচল উড়ে যাচ্ছিল বলে বাঁ হাতে শক্ত করে সে আঁচলের কাণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

দেবীদাস এবার আরও কাছাকাছি এসে ডাকলেন রমলাকে।

রমলা মুখ ফেরাল। দেবীদাসকে দেখল কয়েক পলক। মনে হল যেন, দেবীদাসকে দেখবে আশা করে নি।

দেবীদাস বললেন, "বাড়ি ছেড়ে এ-ভাবে বাইরে বেরিয়ে এসেছ?"

রমলা কোনো জবাব দিল না। তার মুখ পাথরের দাঁতের মতন দেখাচ্ছিল, সাদা প্রাণহীন। কিছু চুল তার কান এবং গালের কাছে, কপালে এলোমেলো হয়ে জড়িয়ে ছিল, উড়ছিল। চোখের দৃষ্টি ঠাণ্ডা; সত্যিই সে কোনো আচ্ছন্নতার মধ্যে আছে।

দেবীদাস কাঁধে হাত দিলেন রমলার, "চলো।" উনি কাঁধে হাত রেখে এবং আস্তে করে চাপ দিয়ে যেন রমলার এই অর্ধচেতনা ভাঙতে চাইলেন, ভাঙিয়ে বাড়ির দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

রমলা দাঁড়িয়ে থাকল, তার ছায়া পড়েছে মাঠে, ছায়াটি দেবীদাসের ছায়ার পাশাপাশি মিশে আছে। খুব আস্তে নিশ্বাস নিচ্ছিল রমলা, চাঁদের আলোয় তার সাদা দীর্ঘ সুন্দর হাত মোমের মতন মসৃণ মনে হচ্ছিল।

দেবীদাস আর দাঁড়িয়ে থাকতে দিলেন না রমলাকে, আস্তে করে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন, কাঁধ থেকে হাত সরালেন না।

"তুমি এভাবে বাইরে চলে এলে কেন? আসা উচিত হয় নি।" দেবীদাস বললেন।

রমলা কথা বলল না। সে হাঁটছিল।

দেবীদাস আবার বললেন, "আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তোমায় কোথাও দেখতে না পেয়ে দুর্ভাবনা হচ্ছিল।"

রমলা ক্রমশ তার চেতনার মধ্যে আসছিল। এখন সে দেবীদাসকে এবং নিজেকে যেন সম্পূর্ণ করে অনুভব করছিল; তার চোখে বাড়ি, পথ, জ্যোৎস্না এবং রাত্রির ধারণাগুলি ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হচ্ছিল, সে দেবীদাসের কথা শুনতে পাচ্ছিল। দেবীদাস ভয় এবং দুর্ভাবনার কথা বললেন, রমলা বুঝতে পারল।

ফটকের কাছাকাছি এসে দেবীদাস আবার বললেন, "তুমি কি রোজ এইভাবে বাইরে চলে আস?"

রমলা মাথা নাড়ল; বোঝা গেল না সে না বা হ্যাঁ বলল।

দেবীদাস ফটকের কাছে এসে রমলার কাঁধ থেকে হাত সরালেন; রমলা ভেতরে এল। ফটক বন্ধ করে দিয়ে দেবীদাস রমলার সামান্য পিছনে পিছনে আসতে লাগলেন। তাঁর মন বার বার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল, কখনও সেই দুঃস্বপ্ন, কখনও রমলার শূন্য বিছানার কথা ভাবছিলেন। সামান্য আগে জ্যোৎস্নালোকে যে দৃশ্যটি তিনি দেখেছেন, তার কথাও তাঁর মনে আসছিল। এর কোনোটিই স্বাভাবিক নয়, প্রত্যাশিত নয়, তবু দেবীদাসের মনে হচ্ছিল, তিনি যেন কোনোদিন ভুলে যাওয়া স্বপ্নের মতন এসব দেখেছেন।

রমলা সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় এল, বারান্দায় এসে নিজের বিছানার কাছে দাঁড়াল। দেবীদাসও স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

হাওয়ায় মশারির জাল দুলে দুলে উড়ছিল। দেবীদাস হাত বাড়িয়ে মশারি সরিয়ে রমলাকে বসতে বললেন।

রমলা বসল; দেবীদাসও স্ত্রীর পাশে বসলেন। বাগান এবং মাঠের দিকে মুখ করে বসে সাদা ঠাণ্ডা জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকল দুজনেই। অনেকক্ষণ কেউ কোনো রকম সাড়া দিল না। শেষে দেবীদাসই কথা বললেন।

দেবীদাস বললেন, “তুমি আজকাল একলা বাইরে শোও। আমি কিছুই বুঝতে পারি না। রাত্তিরে ঘুমোও না?”

“ঘুম ভেঙে যায়—” রমলা বলল। তার গলার স্বর শান্ত, মৃদু, ঠাণ্ডা।

দেবীদাস স্পষ্ট অনুভব করতে পারলেন রমলা কি বোঝাতে চাইল। সে কেন ঘুমোতে পারে না, কেন তার ঘুম ভেঙে যায় দেবীদাস তো জানেন, তবে কেন অকারণ এই প্রশ্ন করছেন।

সামান্য সময় চুপ করে থাকলেন দেবীদাস। তাঁর চোখের সামনে রমলার সেই আশ্চর্য মূর্তিটি ভেসে উঠল: জ্যোৎস্নার মধ্যে মাঠে পরিপূর্ণ স্তব্ধতা ও রাত্রির মাঝখানে সে একা দাঁড়িয়ে আছে। কেন? রমলা কি কোনো সান্ত্বনা খুঁজতে যায়? ও কি এইভাবে কোথাও চলে যাবার চেষ্টা করে প্রত্যহ, অথচ পারে না? রমলা কি দেবীদাসের গৃহ ও আশ্রয় ছেড়ে নিরাত্মীয় বিশ্বের মধ্যে এসে দাঁড়াতে চায়? কিংবা কোনো দুঃস্বপ্নের ঘোরে সে সুমিত্রাদের কাছে গিয়ে দেবীদাসকে আরও স্পষ্ট করে জানার জন্যে বিছানা ফেলে উঠে আসে?

দেবীদাস বেদনা বোধ করছিলেন। যদি এভাবে কোনোদিন কোথাও চলে যায় রমলা, ভুল করবে।

“তুমি এভাবে একলা বাইরে চলে যাও কেন?” দেবীদাস বললেন, দুঃখের গলায় সহানুভূতির স্বরে।

“জানি না।” রমলা ছোট করে জবাব দিল।

“আমার মনে হল, তোমার তেমন জ্ঞানও থাকে না তখন।··· এভাবে বাইরে যেতে নেই।” দেবীদাস কোমল করে বললেন। তাঁর কথাগুলি সরল, কিন্তু অর্থ যেন আরও একটু গভীর।

রমলা নীরব থাকল। তারপর এক সময় বলল, “আমার আর জ্ঞান নেই। কি হবে জ্ঞানে!”

দেবীদাস বুঝতে পারলেন। রমলা বাস্তবিকই জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছে। তার কাছে এই অবস্থাটা সহ্যাতীত।

গভীর করে নিশ্বাস ফেললেন দেবীদাস, "এভাবে চললে তুমি পাগল হয়ে যাবে।"

রমলাকে এখন আর অতটা স্বপ্নাচ্ছন্নের মতন দেখাচ্ছিল না, তার দু চোখের মণি জেগে উঠেছিল। বলল, "আমার কিছু হয়ে গেলেই আমি বাঁচি।"

দেবীদাস লক্ষ করলেন রমলার গলায় তিক্ততা নেই, বিতৃষ্ণা নেই, সে অতিরকম নিস্পৃহ, হতাশ। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, কি মনে হওয়ায় বললেন না। স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরালেন। রমলার বিবেচনাবোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেবীদাস বুঝতে পারলেন না, রমলা কি করে ওকথা বলতে পারল!

"রমলা—" দেবীদাস ধীরে ধীরে বললেন, "আমি আগে কখনও তোমায় এত অস্থির হতে দেখি নি। তোমার স্বভাব বদলে গেছে। আজকাল তুমি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছ।"

রমলা কোনো সাড়া দিল না। হাতের তালুতে মুখ ভর করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

দেবীদাস কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকলেন, কিছু ভাবছিলেন, শেষে স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "এই জগতটা তোমার একেবারে অচেনা নয়, কিছুটা চেন। অধীর হয়ে এমন কিছু করো না যাতে কোনো লাভ নেই।"

"আমার লাভ কোথাও নেই।" রমলা বলল।

দেবীদাস সঙ্গে সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। ভাবলেন সামান্য, তারপর বললেন, "অনেক সময় মানুষ লোকসানকেও লাভ বলে ভুল করে। ভাল না হোক, নিজের ক্ষতি নিজে করো না।"

রমলা স্বামীর দিকে মুখ ফেরাল, দেখল দেবীদাসকে, বলল, "বুদ্ধিমানে করে না। আমি বুদ্ধিমান নই।"

না বোঝার মতন কিছু নয়, দেবীদাস বুঝতে পারলেন, রমলা তাঁকে আঘাত করল। আহত হলেন না দেবীদাস, বললেন, "হয়তো তুমি

ঠিকই বলেছ।...তবে এখানে আমি নিজের ক্ষতির কথা ভাবি নি, তেমন করে ভাবি নি অন্তত।” বলে সামান্য থেমে থাকলেন দেবীদাস, অন্যমনস্ক হলেন, তারপর বললেন, “তুমি আজ আমায় বড় বেশী রকম ভয় পাইয়ে দিয়েছ।...বেশ, তোমার যা জানার ইচ্ছে আমি তোমায় বলব। তোমার এই অশান্তি তাতে কতটুকু কমবে আমি জানি না, তবু বলব।...আজ না, পরে অন্য সময়...।” দেবীদাস নীরব হলেন।

রমলা স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। দেবীদাসের মুখের ভাবে কোথাও প্রতারণা নেই। মুখ বিষণ্ণ, হয়তো এখনও কোথাও তাঁর মানসিক উৎকণ্ঠার এবং কোনো রকম ক্লেশের কালিমা লেগে আছে, তবু ওই মুখ সংযত। দেবীদাস দূর প্রান্তরের দিকে অপলকে তাকিয়ে ছিলেন, তাঁর নিশ্বাস পড়ছিল না, বুকের মধ্যে জমছিল।

কিছু সময় এইভাবে কাটল, দুটি মানুষ নীরবে বসে থাকল। দেবীদাস কি যেন ভাবছিলেন, তন্ময়; রমলাও কিছু ভাবছিল, অন্যমনস্ক। শেষে দেবীদাস নিশ্বাস ফেললেন দীর্ঘ করে, বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, “শীতাংশুদের কাছে তুমি আমায় চিনতে যেও না, ভুল মানুষ চিনে আসবে।” দেবীদাস আস্তে আস্তে ঘরের দিকে চলে গেলেন।

রমলা অনেকক্ষণ একই ভাবে বসে থাকল, চোখের সামনে জ্যোৎস্না বই কিছু ছিল না, জোয়ারের মতন এই জ্যোৎস্নায় বাগান, কাঁটাগাছের বেড়া, মাঠ, পথ এবং দূরবর্তী বৃক্ষগুলি অসাড় ও ছায়াসদৃশ লাগছিল। রমলা এই জ্যোৎস্নার মধ্যে কোনো সৌন্দর্য বা সুখ খুঁজছিল না, সীমাহীন এক শূন্যতার মধ্যে তার অনুভূতি অত্যন্ত উদাসীনভাবে যেন ভাসছিল। নির্দিষ্ট করে বা স্থির করে তার কিছু মনে আসছিল না, সে শুধু গভীর এক বঞ্চনা অনুভব করছিল, এবং অতিরিক্ত দীনের মতন নিজের সমস্ত অস্তিত্বকে অর্থহীন মনে করছিল। নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ, নিরর্থ জীবনের বেদনায় শেষাবধি তার দু চোখ ভরে জল এল।

দেবীদাস আর বারান্দায় আসেন নি। তিনি ঘুমিয়েছেন কিনা তাও বোঝা যাচ্ছিল না। রাত বুঝি শেষ প্রহরে, রমলা বিছানায় শুয়ে ছিল। শুয়ে শুয়ে নিজের কথা ভাবছিল।

জীবনের শুরু কোথায়, কবে, কেমন করে হয়েছিল রমলার ভাল মনে নেই। লোকমুখে শুনেছে, কাশীতে। কাশীতে তার বাবা শাস্ত্রচর্চা করতেন, অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর মোহ ছিল, সম্মানও ছিল। বাবা মারা গেলেন, কাশীর গঙ্গার জল তাঁর সমস্ত অধ্যাত্মবিদ্যাকে ধুয়ে কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে গেল কেউ জানে না, ভাদ্র মাসের সকালে একবার যেন রমলা মা'র সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাবাকে খুঁজতে। মনে পড়ে না, তবু খুব অস্পষ্ট ওইটুকু স্মৃতি যেন জোর করে ধরে রাখা আছে।

কাশীতে বাবার জানাশোনা ভদ্রলোক ছিল অনেক, থিয়জফিক্যাল সোসাইটির এক ভদ্রলোক মাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন, তাঁর এক বন্ধুর কাছে। রমলার সেই বাড়ির কথা আবছা মনে পড়ে, ফটক লাগানো মস্ত পাঁচিল ঘেরা বাড়ি, মাথা উঁচু নারকোল গাছ কয়েকটা, নীচে ঘোড়ার আস্তাবল, কাঠের সিঁড়ি, বড় বড ঘর, ফাঁকা, অন্ধকার, ধুলোয় ভরা। পুরোনো এক গন্ধ উঠছে সবখানে, দেওয়ালগুলো দিনের পর দিন ফ্যাকাসে হয়ে হয়ে বাসি রঙ ধরে গিয়েছিল, বালি ঝরে ঝরে পড়ত। কত যেন ঘর ছিল সে বাড়িতে, কে জানে! মানুষ ছিল মাত্র দুজন; একজন গেরুয়া বসন পরত, কাঁধ পর্যন্ত চুল ছিল তার, সাদা চুল, রঙ ছিল সোনার মতন। বাড়ির একপাশে এক মস্ত ঘরে থাকত সে; ঘর জুড়ে ফরাসপাতা, চাদর একেবারে চিট; সমস্ত ঘর ভর্তি করে দেবদেবীর ছবি, বিরাট বিরাট, ছবিগুলো মাথায় রমলার চেয়ে বড় বই ছোট ছিল না। ঘরটায় আর ছিল ধূপধুনোর গন্ধ, কিছু বইপত্র, দোয়াত কলম, একটা ডেস্ক। মা বলেছিল, সাধুদাদু বলবে ওঁকে। রমলা সাধুদাদুর ঘরে ঢুকত না বড়, তার ভয় করত। সাধুদাদু ওই ঘরেব জানলা খুলত না বড় একটা, ঘরটা আবছা

হয়ে থাকত। রাত্রে ওই ঘরে ভূত ডাকা হত। কারা যেন আসত সব, তারপর দরজা বন্ধ করে ভূত ডাকা চলত। মা বলত, ভূত নয়, আত্মা।

কলকাতার সেই ভূতের বাড়িতে অন্যজন যে থাকত, তাকে দিদিমা বলত রমলা। রূপকথার রাজকন্যার মতন দিদিমা শুধু তার ঘরে পালঙ্কে শুয়ে থাকত। ছেলেবেলায় বুড়ি যে সত্যিই রাজকন্যা ছিল তাতে সন্দেহ নেই, তার বুকের রঙ ছিল পদ্মর মতন, এমন ফরসা আর নরম। দিদিমা আফিঙ খেত, আর পালঙ্কে শুয়ে থাকত ঝিম মেরে। মাঝে মাঝে তাঁর মাথায় পাগলামি ভর করত। তখন শুধু সাজত, যত রাজ্যের পোশাক গয়না বার করে, উলঙ্গ হয়ে সাজত, আর খারাপ খারাপ কথা বলত।

দিদিমা হুট করে একদিন মরে গেল। দিদিমা মরে যাবার পর সাধুদাদু মাকে বলল ঃ আমার সঙ্গে হরিদ্বার চল্, ওদিকে ঘুরে বেড়াব। তোর মেয়েকে আমার এক ভাইপোর কাছে দিয়ে যাই। মানুষ করতে হবে তো!

মা প্রথমে রাজী ছিল না, পরে রাজী হয়ে গেল। না হয়ে উপায় ছিল না। মা'র স্বভাব ছিল ওই রকম, সংসারে একেবারে জড়ানো ছিল না; সুখদুঃখ, আপন-পর প্রায় যেন সমান ছিল। তা ছাড়া মেয়েকে যখন কোথাও না কোথাও গচ্ছিত করেই যেতে হবে, দুদিন পরেই হোক কি দশদিন পরে—তখন আপত্তি করে লাভ কি।

মুঙ্গেরে এল রমলা। ততদিনে তার বেশ জ্ঞান হয়েছে, বড় হয়ে উঠেছে অনেকটা। মুঙ্গেরে ছিলেন বনবিহারীবাবু, সাধুদাদুর ভাইপো। তিনিই হলেন পালক। ধনী মানুষ, কিন্তু সদাশয়। স্ত্রী মারা গেছে অনেক দিন, বাড়িতে বড় মেয়ে আর দুই ছেলে। মেয়ে মণিদি, দেখতে তত সুন্দরী নয়, কিন্তু সরল আর হাসিখুশীভরা স্বভাব বলে মণিদিকে বড় সুন্দর লাগত। ছেলেদের মধ্যে বড়—শিরীষ, ছোট গিরীশ। গিরীশ ছিল রমলার সমবয়সী, শিরীষ বছর চার পাঁচের বড়; তারও বছর দুই বড় মণিদি।

পারিবারিক আবহাওয়ায় জীবন কাটানো বলতে যা বোঝায় মুঙ্গেরেই তেমন জীবন কেটেছে রমলার। কাকাবাবু—বনবিহারীবাবু মেয়ের যত্নে রেখেছিলেন তাকে। কোথাও কোনো রকম ত্রুটি রাখেন নি। উকিল মানুষ, পশার ছিল খুব, সময় পেতেন না, তবু এক একদিন ডেকে রমলাকে যত রাজ্যের পড়া ধরতেন। বলতেন: 'তোর মাথা ভাল, মন দিয়ে লেখাপড়া করলে ফার্স্ট হবি।'...রমলার মাথা তেমন কিছু ভাল ছিল না, ভাল মাথা ছিল গিরীশের। শিরীষদা মাঝারি। আর মণিদি পড়াশোনা করত না; বলত, দূর বাপু, আজ বাদে কাল বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে হাতা-খুন্তি নাড়ব, অত পড়াশোনা কে করে। বাবার সংসারেও মণিদি হাতা-খুন্তির তদারক করত।

মাঝে মাঝে চিঠি আসত মা'র। সাধুদাদুর সঙ্গে কোন কোন তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাধুদাদুও এক-আধবার চিঠি লিখতেন। মা'র শেষ চিঠি এসেছিল পুষ্কর থেকে। তাতে মা লিখেছিল: রমলা মা আমার, আমার খুব অসুখ; তোমায় দেখতে মন বড় ছটফট করে; আর বুঝি তোমায় দেখতে পাব না। আমি তোমায় ভগবানের হাতে তুলে দিয়ে এসেছি, ভগবানই তোমায় দেখবেন। তুমি দুঃখ করো না।

মা'র জন্যে মন খারাপ হত, কিন্তু সয়ে গিয়েছিল বলেই তেমন যেন আর লাগত না। পুষ্করেই মা মারা গেল। সাধুদাদু চিঠি লিখলেন বড় করে। অনেক কিছু বুঝিয়ে। রমলার যা বয়েস তাতে অত কথা বোঝার কিছু ছিল না, শুধু বুঝল, মা'র অসুখ বুঝেই সাধুদাদু তাকে ওইভাবে আড়াল করে নিয়ে হাওয়া খাইয়ে বেড়াচ্ছিল। সাধুদাদু লিখেছিল: তোর নামে বিহারীর কাছে আমি গয়নাগাটি রেখেছি। বড় হয়ে যখন বিয়ে করবি, সব পাবি। আমি এবার কেদারবদরীর দিকে যাব আবার। চিঠিপত্র পাবি না।

সাধুদাদুর চিঠি আর কোনো কালেই আসে নি। তিনি নাকি পাহাড়ী নদী পেরোতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। খবরটা যখন পাওয়া

গেল তখন মণিদির বিয়ে। বিয়ের গোলমালে সাধুদাহুর মৃত্যু হারিয়ে গেল।

মজঃফরপুরে চলে গেল মণিদি, এ বাড়িতে তারা তিনজনঃ কাকাবাবু, শিরীষদা আর গিরীশ। শিরীষদা তখন কলেজে পড়ছে। রমলাও তেরো চৌদ্দ বছরের মেয়ে।···বছর দু তিন কেটে গেল, কোথাও কোনো গোলমাল ঘটল না। এক যা, রমলা শিরীষদার চোখমুখ থেকে নিজের বয়স জানতে শিখল। শিখে অখুশী হল না। নিজেকে দেখার-জন্যে আয়না ছিল, কিন্তু আয়না সব জিনিস দেখাতে পারে না। শিরীষদা যদি আয়নার কাচ হত তবে রমলা তার ভেতরের রহস্যটা বুঝতে পারত না। ওই বয়সে মেয়েদের শরীর ওপরে যতটা বাড়ে ভেতরে তারও বেশী শেকড় ছড়ায়। রমলা শিরীষদার চোখে নিজের রহস্য চিনতে শিখল। পরম রহস্যের মতন বুঝল তার মধ্যে এমন আকর্ষণ আছে যা শিরীষদাকে বশ করে ফেলেছে।

কাকাবাবু মারা গেলেন পরের বছর, শিরীষদা তখন বি-এ পাশ করেছে।···কথা ছিল আইন পড়বে; কিন্তু সে পাটনায় গিয়ে আইন পড়তে চাইল না। মণিদি কত বলল, জামাইবাবু অনেক বোঝাল, তবু শিরীষদা আইন পড়তে রাজী হল না, বলল, গিরীশ পড়বে, আমি ওকালতি করতে পারব না। তখন রমলাও চেয়েছিল, শিরীষদা পাটনায় না যাক। সকলের সামনে শিরীষদার পাটনায় না যাওয়ার জন্যে অন্যদের মতন রাগ দেখাত, কিন্তু মনে মনে সে খুশী ছিল।

হ্যাঁ, আসল কারণ রমলা। শিরীষদা রমলাকে রেখে বাড়ি-ছাড়া হবে না। এতদিন যেন স্বাভাবিকভাবেই রমলা তাদের সম্পত্তির অন্তর্গত ছিল, এবার অভিভাবকহীন বাড়িতে শিরীষদা হল মাথা; সে তার সম্পত্তিতে ভোগদখল বসাল।

রমলা আপত্তি করে নি, বাধা দেয় নি, এমন কি মনেও করে নি, কাজটা অনুচিত হচ্ছে। সে সহজ ভাবেই শিরীষদার দখলে চলে গিয়েছিল, কেননা জানত, এবাড়িতে তার অধিকার স্থায়ী হবে।

ওই বয়সে অনেক কিছু জিনিস আছে যা হয় নিতে নেই, না হয় সাবধানে লুকিয়ে-চুরিয়ে নিতে হয়। রমলা বোকামি করেছিল, যা নেবার নয় সে তাই নিয়েছিল, যা গোপনে লুকোচুরির মধ্যে থাকলে তার ক্ষতি হবার ভয় কম ছিল তেমন গোপনতাও রাখে নি। কেন সে এরকম করেছিল সে নিজেও জানত না। জ্ঞান হবার পর থেকে সে দেখেছে, তার বা তাদের নিজের থেকে করার কিছু ছিল না, অন্যের ইচ্ছায় যা হবার হয়েছে; রমলাদের বরাবরই কেউ একজনের না একজনের হাতে দিয়ে গেছে। বাবার বন্ধু তাদের সাধুদাদুর কাছে, সাধুদাদু কাকাবাবুর কাছে তাকে দিয়েছে, মাও তাকে এখানে দিয়ে গিয়েছিল। কাকাবাবু মারা যাবার পর স্বাভাবিকভাবেই সে শিরীষদার হাতে যাবে। নিজের ইচ্ছায় যখন কিছু হচ্ছে না, তখন কখন কি নেওয়া উচিত, কি ভাবে নেওয়া উচিত এ-সব দ্বিধা তার আসে নি। তাছাড়া সে ধরেই নিয়েছিল, শিরীষদা তাকে বিয়ে করবে।

গণ্ডগোল বাধাল গিরীশ। গিরীশ যত বড় হয়ে উঠছিল, ততই তার মুখ খুলছিল। সে ছিল অহংকারী, জেদী, নির্দয়। সে কখনও কোথাও নিজের অধিকার ছাড়ে নি। কাকাবাবু মারা যাবার পর থেকে সে দেখত, রমলার ওপর শিরীষই পুরোপুরি দখল বসিয়েছে; নিজের উত্তরাধিকার অংশত সে চাইত। রমলা তা বুঝতে পারত। কিন্তু তার করার কিছু ছিল না। গিরীশ একদিন সোজাসুজি বলে দিল রমলাকে: 'হয় তুমি মজঃফরপুরে দিদির কাছে যাও, না হয় এ-বাড়ি ছাড়। তোমরা যা করছ দুজনে, তাতে এ-বাড়ির মান বাঁচানো দায়।'

গিরীশের সঙ্গে ঝগড়া করার সাধ্য রমলার ছিল না। বিবাদটা ভাইয়ে ভাইয়ে। মণিদি ছুটে এল মজঃফরপুর থেকে সামাল দিতে, কিন্তু কিছু হল না। শিরীষদা বলল, 'আমি ওকে বিয়ে করব।' গিরীশ জবাবে বলল, 'বাবার বন্দুকটা এখনও এ-বাড়িতে আছে।

তুমি যদি এই বিয়ে কর, আমি মরব। আমি বেঁচে থাকতে আমাদের পরিবারে এ-রকম মেয়ে বউ হয়ে আসতে পারে না।'

বউয়ের জন্যে গিরীশরা কেমন মেয়ে চায়, রমলা জানতে চায় নি। কিন্তু রমলা দেখল সে বউ হল না, হতে পারল না; শিরীষদা সাহস পেল না; অন্য পাত্রীকে বিয়ে করল, রমলা এল মজঃফরপুর। সেখান থেকে পাটনা। পাটনায় কাকাবাবুদেব এক বাড়ি ছিল, ছোট, কাকাবাবুকে মাঝে মাঝে আসতে হত। উনি মারা যাবার পর সেটা খালি পড়ে ছিল। সেই বাড়িতে রমলাকে এসে উঠতে হল, ব্যবস্থাটা শিরীষদার আর মণিদির। মাঝে মাঝে শিরীষদা আসত ব্যবসায়িক কাজেকর্মে; তার কর্মচারীরা আসত। গিরীশ চলে গিয়েছিল কলকাতায় আইন পড়তে। সে আর ফেরে নি, কলকাতাতেই থেকে গেল।

শিরীষদাব বউ হতে পারে নি রমলা, কিন্তু রক্ষিতা হয়ে থাকতে পেরেছিল। যে কোনো কারণেই হোক শিরীষদার কোথাও যেন রমলার ওপর একটা ভয়ঙ্কর দখলদারি স্বত্ব ছিল। সে স্বত্ব সে ছাড়ে নি। হয়তো শিরীষদাও তার জেদ ধরে রেখেছিল; ভাই, বোন এবং বউয়ের ওপর সে তার জেদ দেখিয়েছে, রমলাকে ত্যাগ করে নি, পাটনার বাড়িতে রেখে দিয়েছিল। যুবতী মেয়েরা যখন অনাত্মীয় কোনো পুরুষের ভরণ-পোষণের মধ্যে থাকে, আর থাকার সম্পর্কটা কমবেশী অসামাজিক হয়, তখন তাকে রক্ষিতা ছাড়া আর কি বলা যায়।...শিরীষদার সঙ্গে সম্পর্কটা শেষাবধি তাই ছিল। রমলাকে সে অযত্ন করে নি, অনাদর করে নি; বরং সযত্নেই রেখেছিল।

বয়স যখন আরও বেড়ে গেল, তখন রমলা দেখল, শিরীষদার নানারকম অনুশোচনা এসেছে। ভোগসাধ, ইন্দ্রিয়সুখ মিটে গেছে; মোহ, জেদ, স্বত্বাধিকারের বাসনা আস্তে আস্তে কেটে গেলে যা হয় শিরীষদার তাই হয়েছিল। তখন তার বয়স তাকে গৃহগত করেছে, ছেলেমেয়ের কাছে মান-সম্মান-মর্যাদার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রমলাকে বাঁকিপুরের দিকে একটা ভাড়াটে বাড়িতে পাঠিয়ে দিল শিরীষদা।

দেবীদাস রমলাকে পাটনার বাড়িতেই দেখেন। শিরীষদাদের বাড়ির কাছেই তাঁর ভাড়াবাড়ি ছিল। আলাপও ছিল শিরীষদার সঙ্গে সাধারণ আলাপ। এক-আধবার দেবীদাসও ও বাড়িতে এসেছেন দরকারে।

বাঁকিপুরের দিকে উঠে যাবার পর রমলার একটা মাসহারা আসত, আর কিছু না; কেউ আর আসত না। একবার বড় বিপদে পড়ে রমলাকে দেবীদাসের কাছে যেতে হয়েছিল সুপারিশ চাইতে। তারপর দেবীদাস বার কয়েক তার বাড়িতে এসেছিলেন। শেষে একদিন স্বেচ্ছায় বিয়ে করলেন। তখন রমলার বয়স পঁচিশ ছাড়িয়ে গেছে, সামনে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। রমলা নিজের ইচ্ছায় সেই প্রথম একটা কাজ করল জীবনে, দেবীদাসের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল।

মানুষের স্বভাব তার মুখের আদলের মতন, বয়সে কিছু হেরফের হয়, কিন্তু পালটে যায় না। রমলার স্বভাবে যে নিষ্ক্রিয়তা এবং নির্ভরতা ছিল, তা পালটালো না; সে যেন ধরে নিল, বরাবর যেমন সে এক হাত থেকে আর-এক হাতে চলে যাচ্ছে, এও তেমনি; তফাত শুধু এই যে, শিরীষদা যাবার সময় তাকে দেবীদাসের হাতে দিয়ে যায় নি, ভাগ্য—বা মা'র কথায় ভগবান—তাকে দেবীদাসের হাতে তুলে দিয়েছে।

প্রথম প্রথম সে কৃতজ্ঞের মতন, বাধিত ব্যক্তির মতন থাকত; দেবীদাসের করুণা ও মহানুভবতার কাছে মাথা-মুখ হেঁট করে দিন কাটাত। অনুগত দাসীর মতন দেবীদাসের সংসারে পড়ে ছিল। তারপর দেবীদাস পাটনা ছাড়লেন, ভাগলপুর; ভাগলপুর থেকে আরেক চাকরি; সেখান থেকে এখানে। আজ সাত আট বছরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে শেষের তিন চারটে বছরেই যা রমলা নিজের মতন করে কিছু চাইবার ইচ্ছা অনুভব করেছে। সে স্বামীর ভালবাসা, নিবিড় সঙ্গ, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কামনা করেছে। পায় নি। তার মনে হয়েছে, দেবীদাস তাকে এসব দেবার যোগ্য বলে মনে করেন না;

যেন রমলাকে গৃহ, আশ্রয়, এমনকি শয্যার অংশও দেওয়া যায়, কিন্তু আর কিছু না।

দেবীদাস তাকে যে সম্মান দেন, সে সম্মান প্রেমের নয়, যে কর্তব্য পালন করছেন সে কর্তব্য দায়িত্ববানের, কিন্তু হৃদয় বা মন তার জন্যে ব্যাকুল নয়। তাঁর এই সঙ্গ বা সৌজন্যের আচরণ দেবীদাসকে মর্যাদাবান করছে, তাতেই তিনি তৃপ্ত। রমলার পক্ষে এ-সমস্তই ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে রক্ষিতা হয়ে অনেক কাল ছিল, যৌবনের অনেকখানি রক্ষিতার মতনই ব্যয় করেছে; এখন ফুরোনো যৌবনে রমলা আর দেবীদাসের রক্ষিতা হয়ে থাকতে চায় না, সে এমন কিছু চায় যা তাকে সজীব, সম্ভ্রান্ত ও সুখী করবে।

রমলা ভোর রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল সকালের রোদে। দেখল, দেবীদাস ঝিয়ের হাত থেকে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে টেবিলে বসে চা ঢালছেন। বিছানা ছেড়ে ওঠবার সময় তার চোখ জ্বালা করছিল।

১২

দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকল সুমিত্রা, যেন দেবীদাসকে ঘরের মধ্যে পা বাড়াতে দেবে না।

দেবীদাস বিব্রত বোধ করছিলেন ; স্থির আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষে বললেন, "শীতাংশু বাড়ি নেই ?"

"না", মাথা নাড়ল সুমিত্রা, "তাস খেলতে গেছে।"

জানতেন দেবীদাস, রমলার কাছে শুনেছেন, তাসের খুব নেশা শীতাংশুর, শর্মার কোয়ার্টারের মাঠে সন্ধ্যে থেকে তাসে মত্ত থাকে আজকাল।

শীতাংশু বাড়ি নেই শুনেও দেবীদাস নড়লেন না, বা ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। বোঝাই যাচ্ছিল, তিনি শীতাংশুর খোঁজে আসেন নি।

শোবার ঘরে তখনও রেকর্ডটা বাজছিল, গ্রামোফোনের দম ফুরিয়ে আসার মতন হয়েছে। সুমিত্রা তবু নড়ল না, দরজা ছেড়ে সরে যাবার ইচ্ছে নেই তার, একটু পরেই রেকর্ডটা নিজে নিজেই থেমে যাবে।

দেবীদাসও দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে ক্রমশ এক ধরনের অবিচল ধৈর্য ফুটে উঠছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, দেবীদাস কোনো সঙ্কল্প নিয়ে এ বাড়ি এসেছেন।

সুমিত্রা বেশী রকম অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, তার দৃঢ়তা এবং কাঠিন্য নষ্ট হচ্ছিল, ভীত ভাবটা অত্যন্ত কষ্টে দমন করার চেষ্টা করছিল সুমিত্রা।

"আপনি কি বসবেন ?" সুমিত্রা বলল ; না বলে উপায় ছিল না।

বসার চেয়ার কয়েক পা দূরে বারান্দার ধার ঘেঁষে। চেয়ারের পিঠের দিকে একটা ক্যাম্পখাট গুটিয়ে দেওয়াল-ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো,

াত্রে এই খাট পেতে সুমিত্রা বারান্দায় শোয়। বারান্দার নীচে ফাঁকা াঠে দড়ির খাটিয়া একপাশ করে রাখা আছে, শীতাংশুর শোবার াটিয়া, সে রাত্রে ফাঁকায় শোয়।

দেবীদাস সুমিত্রার মুখের ভাব থেকে বুঝে নিলেন, ঘরের দিকে য়, বারান্দার দিকে গিয়ে তাঁকে বসতে বলছে সুমিত্রা। দেবীদাস এ-বিষয়ে তেমন মন দিলেন না, ক্ষুণ্ণও হলেন না। তিনি মুখ ফিরিয়ে আস্তে হেঁটে বারান্দার ধারে এসে চেয়ারে বসলেন।

ঘরের মধ্যে রেকর্ডটা নিজের থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন অদ্ভুত একটি নীরবতা অনুভব করা গেল। সুমিত্রা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল, বিচলিত, বিভ্রান্ত, ভীত। দেবীদাস সামান্য তফাতে চেয়ারে নীরবে বসে থাকলেন। বারান্দায় বাতি জ্বলছিল।

এখন ঠিক রাত না, ঘন সন্ধ্যা। বারান্দার বাতিটি না জ্বললেও ক্ষতি ছিল না, চাঁদের আলোয় অর্ধেকটা বারান্দাই ফিকে আলোয় ভরে আছে। বাইরে আজ বাতাস ছিল।

সুমিত্রা কি করবে বুঝতে পারছিল না। ঘরে চলে যাবে? দরজা বন্ধ করে দেবে? 'আপনি বসুন, আমি একটু ব্যস্ত রয়েছি—' বলে দেবীদাসকে বাইরে বসিয়ে ঘরে পালিয়ে আসবে? অথবা সুমিত্রা বলবে, 'আমি কি শর্মাদের কোয়ার্টার থেকে ওঁকে ডেকে আনব?'… অনেক রকম মনে এল, কিন্তু কোনো একটা অছিলা করে সুমিত্রা সরে যেতে পারল না। দেবীদাসকে সরাসরি তাড়িয়ে দেবারও কোনো উপায় নেই। শীতাংশু স্ত্রীর এই অসৌজন্যতা সহ্য করবে না, ভীষণ রাগ করবে।

আগে একবার আচমকা দেখা হয়ে গিয়েছিল: সুমিত্রা বেড়াতে বেড়াতে অনেকটা চলে গিয়েছিল সামনের দিকে, দেবীদাসও বেড়াচ্ছিলেন, সন্ধ্যের ঘোরে হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে দুজনেই থমকে গিয়েছিল। সেদিন সুমিত্রা যে ব্যবহার করেছিল, দেবীদাসের তা মনে থাকা উচিত। একটির বেশী কথা বলে নি সুমিত্রা, এবং যেভাবে

চলে এসেছিল তাতে দেবীদাস নিশ্চয় বুঝেছিলেন, এই ধরনের দেখা-সাক্ষাতও সে পছন্দ করে না, বরং ঘৃণা করে। তা সত্ত্বেও দেবীদাস কেন এসেছেন? কেন এলেন?

বসার ঘরের দরজার চৌকাঠ থেকে এক পা এগিয়ে সুমিত্রা দাঁড়াল। পিছনে পরদা। এখানে আসার পর প্রথম প্রথম তাব এই ভয় ছিল, দেবীদাস কখন না এ-বাড়ি এসে পড়েন। কিন্তু উনি আসছেন না দেখে সে ভয় অনেকখানি কাটছিল। আজ দেবীদাস আবার তাকে নতুন করে ভয় দেখালেন।

সুমিত্রা হঠাৎ খুব অসন্তুষ্ট বোধ করল; ভাবল, দেবীদাস যদি বসে থাকতে চান বসে থাকুন, সে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে শর্মাদেব কোয়ার্টারে চলে যাবে, গিয়ে শীতাংশুকে ডেকে আনবে। দেবীদাসের যদি কোনো প্রয়োজন থাকে তবে শীতাংশুর সঙ্গে, তার সঙ্গে নয়।

সুমিত্রা ভাবল, কিন্তু চলে যেতে পারল না। দেবীদাস যদি বাড়ি বয়ে না আসতেন হয়তো এ-রকম বিমূঢ়তা ও অস্বস্তির মধ্যে তাকে পড়তে হত না। কি করে সে দেবীদাসকে বলবে, 'আপনি এখন যান, উনি বাড়ি নেই।' বা কি করে সে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবে!

দেবীদাস চেয়ারটা একটু মাঠের দিকে মুখ করে নিলেন। তিনি এত শান্ত, স্থির এবং অচঞ্চল ভাবে বসে ছিলেন যে, মনে হচ্ছিল সুমিত্রাকে তিনি যেন তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের কোনো আশ্চর্য নীরব প্রভুত্ববলে আকর্ষণ করছেন।

সুমিত্রা অনুভব করতে পারছিল, দেবীদাস অকারণে বসে থাকতে আসেন নি। তাঁর সমস্ত আচরণে একটি উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে কি উদ্দেশ্য?

কিছু বলতে যাচ্ছিল সুমিত্রা, তার আগেই দেবীদাস যেন কেম একটু শব্দ করলেন। সুমিত্রা দেখল, পকেট থেকে সিগারেটের কে বের করে দেবীদাস সিগারেট নিয়ে ধরালেন।

সহসা সুমিত্রা নিজেকে খুব দুর্বল এবং আতঙ্কিত মনে করল

এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে তার পা কাঁপছিল। তাড়াতাড়ি সুমিত্রা বলল, "আপনি বসুন, আমি আসছি···।"

দেবীদাস জবাব দিলেন কথার, বললেন, "তোমার সঙ্গে ক'টা কথা আছে।"

উনি তবে ক'টা কথা বলতে এসেছেন। সেবারেও দেবীদাস এই রকম কি একটা কথা বলেছিলেন—কথা আছে।—কি কথা? সুমিত্রা স্পষ্ট বুঝল না, অথচ অনেক কিছু যেন জট পাকিয়ে তার মাথায় এল। কোনো কথা শুনতে বা বলতে তার ইচ্ছে করছিল না। তার কেমন এক ভয় উঠছিল, অসন্তোষ জাগছিল।

দেবীদাস আবার বললেন, "তোমায় একটু বসতে হবে। কিছু নেই বসার?"

সুমিত্রা একবার ভাবল, বলেঃ আপনার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই। আমি বসতে পারব না। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না। এবং নিজেকে কিছুটা স্থির সংযত করার জন্যে সে কিছুটা সময় খুঁজল। একটু যেন সময় প্রয়োজন সামলে উঠতে। কোনো রকমে বলল, "আমি আসছি···" বলে সুমিত্রা জবাবের অপেক্ষা করল না, ভেতরে চলে গেল।

দেবীদাস বসে থাকলেন, একা। তাঁর মন এখন নিশ্চিন্ত। দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নেই। মনের অতি দূরে কোথাও একটি মৃদু আলোর মতন জ্বলছিল। বর্ষার বা শীতের কুয়াশায় দূরের বাতি যেমন জ্বলে, ভিজে, অনুজ্জ্বল, অথচ একটি নীলাকার চক্র তৈরী করে, তেমন করে জ্বলছিল। এই আলোটি তাঁকে বুঝি বেদনা দিচ্ছিল।

সিগারেট অনেকখানি শেষ হল, তবু তিনি একা। সামনে অনাবিল জ্যোৎস্না। মাঠের কোথাও কোথাও এবং ঝোপের তলায় ছায়া পড়েছে থোকা থোকা। বাতাস এলোমেলো। এখনও মাঝে মাঝে মিহি ধুলো ভেসে আসছিল বাতাসে।

দেবীদাস সিগারেট নিবিয়ে ফেলে দিলেন। রমলা বাড়িতে।

আজ সকাল থেকে তার শরীর খারাপ। সামান্য জ্বরের মতন হয়েছে। দেবীদাস যখন বাড়ি থেকে বেরোন, রমলা বারান্দায় বসেছিল। সে অনেকটা পথ দেখতে পেয়েছে দেবীদাসকে। শীতাংশুদের বাড়ির দিকে আসছেন তিনি, রমলা বারান্দায় বসে অনুমান করেছে হয়তো।

অনেকটা সময় গেল, শেষে সুমিত্রা এল।

দেবীদাস বললেন, "বসো।"

সুমিত্রা বসল না। দাঁড়িয়ে থাকল। দেবীদাস আবার বসতে বললেন, সুমিত্রা যেন বাধ্য হয়েই বারান্দার এক পাশে মাটিতে বসল।

কিছু সময় অস্বস্তিকর গুমোট এক নীরবতার মধ্যে কাটল। শেষে দেবীদাসই কথা বললেন। "তোমায় ক'টা কথা বলব, কিছু মনে করো না।"

সুমিত্রা মাঠের দিকে মুখ করে বসে থাকল। সে জানত, দেবীদাস কিছু বলবেনই; যথাসাধ্য নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিল সুমিত্রা।

দেবীদাস আর কোনো ভূমিকা করলেন না, বললেন, "আমি তোমাদের কোনো খবরাখবর জানতাম না। শীতাংশুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে এও আমার জানার কথা নয়। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাওয়াটা নেহাত ঘটনাচক্রে ঘটেছে।...তাই না?"

সুমিত্রা কোনো রকম সাড়া দিল না। ঘাড় সামান্য পাশ করে সে আগের মতনই বসে থাকল। দেবীদাস আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন, তাঁর গলার স্বর ঘন, শান্ত শোনাচ্ছিল।

দেবীদাস বললেন, "এখানে এসে তুমি মুশকিলে পড়েছ, খুব অখুশী। আমি শুনেছি, দেখেছি—।" নিশ্বাস নেবার জন্যেই যেন থামলেন একটু, তারপর বললেন, "আমার বাড়িতেও খানিকটা অশান্তি যাচ্ছে।"

সুমিত্রা মাটির পুতুলের মতন বসে, তার হাত পা মুখ কিছু নড়ছিল না।

"তুমি শীতাংশুকে আমার কথা কিছু বলেছ ?" দেবীদাস বললেন।

সুমিত্রার স্থির নিশ্চল ভঙ্গিটি ভাঙল এবার, সে মুখ ফেরাল... দেখল দেবীদাসকে।

দেবীদাস বললেন, "শীতাংশু তোমায় কি কিছু বলে নি ?"

সুমিত্রা কিসের যেন এক সন্দেহ করে ভেতরে ভেতরে ভীষণ চমকে গেল, ভয় পেল। "না", অস্ফুট স্বর শোনা গেল তার গলায়।

দেবীদাস সুমিত্রার মুখ লক্ষ করলেন। "রমলা-শীতাংশুর কাছ থেকে আমার কথা কিছু শুনেছ..." দেবীদাস মৃদু পরিষ্কার গলায় বললেন।

সুমিত্রা স্তব্ধ হয়ে গেল। শীতাংশু তাকে কোনোদিন বলে নি, ঘরের কথা—সুমিত্রার কাছ থেকে শোনা কথা—সে রমলাকে বলে এসেছে। সুমিত্রার চোখ কান মুখ কেমন যেন হীনতা বোধের লজ্জায় অস্বস্তিবশত গরম হয়ে উঠল। চোখের তলা, কপাল জ্বালা করতে লাগল। সুমিত্রা ধারণা করে নিল, শীতাংশু স্ত্রীর কাছে যা শুনেছে রমলাকে বলে এসেছে। স্বামীর ওপর আক্রোশ ও অদ্ভুত এক বিরূপতা অনুভব করছিল সুমিত্রা।

দেবীদাস নীরবে অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, "শীতাংশুকে তুমি বলেছ, তোমার দিদির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ছিল, তারপর তার অসুখের জন্যে হয় নি।"

সুমিত্রা কথা বলল না। তার সমস্ত শরীর অদ্ভুত এক উত্তেজনায় কাঁপছিল, গলা শুকিয়ে জ্বালা করছিল, সিসের পুঁটলির মতন শক্ত লাগছিল কণ্ঠনালীর কাছটায়। ঠিক বেহুঁশ নয়, অথচ ভাল করে হুঁশও ছিল না যেন তার।

"তুমি যা বলেছ তা কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে ?" দেবীদাস বললেন, "রমলাও বিশ্বাস করে নি।"

সুমিত্রার দম যেন বন্ধ হয়ে এসেছে, সে কোনো রকমে নিজেকে বাঁচাতে চাইল, বলল, "কারুর বিশ্বাস অবিশ্বাসে আমার কি ?"

দেবীদাস সামান্য সময় দিলেন, যেন সুমিত্রাকে বোঝাতে চাইলেন, কথাটা কি তুমি ঠিক বললে! তারপর বললেন, "বিশ্বাসে কার না দরকার। শীতাংশু তোমায় বিশ্বাস করুক এই ভেবেই না এসব কথা তুমি বলেছ।"

সুমিত্রার মনে হচ্ছিল যেন শূন্যের কোনো অজ্ঞাত স্থান থেকে একটা বিশ্রী ফাঁস এসে তার গলায় পড়েছে। বিচলিত বিভ্রান্ত বোধ করে সুমিত্রা রুক্ষ স্বরে বলল, "আমার নিজের সংসারের কথা আমি বুঝব।"

দেবীদাস চুপ করে থাকলেন সামান্য, ভাবছিলেন কিছু, নিশ্বাস ফেলে বললেন, "বেশ তো, তোমাদের ব্যাপার তোমরাই বুঝে নিও। তবে আমারও একটা নিজের দিক আছে। আমাদের সংসার আমাকেও তো বুঝতে হবে। রমলাকে এরপর আমার কি সব কথা খুলে বলা উচিত না!"

কথাটা যেন সেই দড়ির ফাঁস, সুমিত্রার গলায় আঁট হয়ে বসল ভীত, সন্ত্রস্ত, বিহ্বল চোখে সুমিত্রা দেবীদাসের দিকে তাকাল।

অল্প সময় চুপচাপ। তারপর দেবীদাস বললেন, "আমার কোনো উপায় নেই। তুমি যখন শুরু করেছ আমায় শেষ করতে হবে।"

সুমিত্রা চোখের পাতা ফেলতে পারল না, নিশ্বাস বন্ধ করে পাথরের মতন বসে থাকল। ক্রমশ সে নিজের সর্বাঙ্গে শিথিলতা অনুভব করছিল, রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে যেন হাত পা অসাড় হয়ে আসছে।

পরিপূর্ণ স্তব্ধতা ও কঠিন কষ্টকর আবহাওয়ার মধ্যে কিছু সময় কাটল। দেবীদাস গলা পরিষ্কার করে নিলেন। বললেন, "আমি অনেক ভেবে দেখেছি, দেখলাম অন্য কোনো উপায় নেই।...আমার অবস্থাটা বাইরে সকলের কাছে যা দাঁড়িয়েছে তার দায়িত্ব তোমার। তুমি যে কেন এখানে এসে পর্যন্ত এরকম একটা বিরক্ত ও ঘেন্নার ভাব নিয়ে থাকলে আমি জানি না।"

সুমিত্রার যেন জ্ঞান লোপ পেয়েছিল, বলল, "আপনার স্বভাব যে জানে তার যদি আরও কিছু থাকত সে করত, আমি শুধু ঘেন্নাই করেছি।"

দেবীদাস তাকালেন, সুমিত্রার সমস্ত মুখে ঘৃণার কালি পড়েছে। তার রুষ্ট, ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে দেবীদাসের কিছু যেন মনে পড়তে যাচ্ছিল, অথচ অন্য কথা মনে এসে গেল। দেবীদাস বললেন, "আমার স্বভাব সাধারণ মানুষের স্বভাব।"

"সাধারণ মানুষের!" তিক্ত গলায় সুমিত্রা বিদ্রূপ করে বলল, "লোকে বলে সাধুপুরুষের স্বভাব।"

"লোকে ভুল করে; আমরা সংসারে ভুলই বেশী করি। করি না?"

"আমি করি না। আপনাকে আমি চিনি।"

"চেন?"

"খুব ভাল করে।...যারা আপনাকে চেনে না তাদের আপনি আপনার চেহারা দেখান, আমায় নয়।"

"তোমার বোধ হয় এখানেই মস্ত ভুল হচ্ছে। অন্যকে চিনে মানুষের নিজের উপকার কিছু হয় না, বরং অপকার হয়। আমায় খুব বেশী রকম চিনতে গিয়ে তুমি নিজের দিকটা দেখ নি।"

সুমিত্রা কথাগুলো কিছু যেন বুঝল, বাকি বুঝল না। তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ হল না বোঝবার। বলল, "আপনি কি আমায় আমার দিকটা চেনাতে এসেছেন?"

"না, না। নিজেকে নিজে চিনতে হয়, অন্যে চিনিয়ে দিলে হয় না। রো, শীতাংশুদের কাছে তুমি আমাকে যেভাবে চিনিয়েছ সেভাবে..."

"আপনি যা আমি তার চেয়ে কম চিনিয়েছি—" সুমিত্রার গলা াপছিল, বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল।

দেবীদাস শান্ত গলায় জবাব দিলেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, কম চনিয়েছ।" বলে দেবীদাস সামান্য বসে থেকে ওঠার মতন ভাব

করে বললেন, "তোমার বয়স এখনও বেশী হয় নি, সব কথা ঠিক মতন বুঝবে না। তবে, তু-একটা কথা তোমার বোঝার চেষ্টা করা উচিত।···মানুষের অনেক ভোগ আছে যা নিজে ভুগতে হয়, না ভুগে উপায় থাকে না। সেটা অনেক ভাল। কিন্তু অন্যকে অকারণে ভোগাতে নেই। তুমি যে-তুঃখে নিজে ভুগতে পারতে তাকে তুমি নিজের তুঃখ করে রাখো নি; ঘৃণা করে নিয়েছ। অনুতাপ কে না করে, মানুষ মাত্রেই করে, কিন্তু অনুতাপ করার বদলে তুমি যা করেছ এক রকমের আত্মরক্ষার চেষ্টা। তুমি ধরেই নিয়েছিলে আমরা সবাই জন্তু। যা করেছ তুমি সেটা অসভ্যতা; ওটা বিদ্বেষ, রাগ, হীনতা।"

দেবীদাস চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দীর্ঘ ও প্রবীণ চেহারা এখন যেন আরও দীর্ঘ বিশাল মনে হচ্ছিল, সুমিত্রা বারান্দার মাটিতে বসে নিজেকে অত্যন্ত ছোট, হীন, তুচ্ছ অনুভব করল। দেবীদাসের কোনো কথাই সে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল না। সুমিত্রা অন্য কিছু ভাবছিল, যা তাকে ভীত ও আতঙ্কিত করছে।

দেবীদাস চলে যাচ্ছেন ভেবে সুমিত্রা হঠাৎ বলল, "আপনি রমলাদিকে সব কথা বলেছেন?"

"না, এখনও কিছু বলি নি; বলব।"

"না, আপনি বলবেন না।" সুমিত্রা চিৎকার করে উঠেছিল প্রায়। তার গলার স্বর বিশ্রী শোনাল।

দেবীদাস দাঁড়িয়ে থাকলেন নিশ্চল হয়ে, পরে বললেন, "না বলে উপায় নেই। রমলা বড় অশান্তির মধ্যে আছে।"

সুমিত্রার বুকের তলা হঠাৎ যেন শূন্য হয়ে গেল। নিজেকে অকস্মাৎ সে অত্যন্ত দীন, রিক্ত ও দূরবর্তী অনুভব করল। অতি কষ্টে বলল, "আপনার কি লজ্জা নেই? সম্মান নেই? সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান নষ্ট করে বসে আছেন? নিজের স্ত্রীর কাছে আর মর্যাদা পাবেন আপনি?"

দেবীদাস সে-কথার কোনো জবার দিলেন না। আস্তে এগিয়ে

এসে বারান্দার দু ধাপ সিঁড়ি নামলেন। দাঁড়ালেন, বললেন, 'আমার যথেষ্ট বয়েস হয়ে গেছে, সুমিত্রা। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার জীবনের ভাল রকম একটা সম্পর্ক হল না। হওয়া উচিত ছিল।...কি জানি আজকাল কেন যেন মনে হয়, যা আমার উচিত ছিল আমি তা করি নি। আমার সব ভুল শুধরে নেবার বয়েস এখন নেই। তবু যতটা হয় তার চেষ্টা করা ভাল।" দু মুহূর্ত থেমে থাকলেন দেবীদাস, আবার বললেন, "স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে আমি শ্রদ্ধা করি। তবু আমি আমার জীবনে স্ত্রীর প্রতি আন্তরিক হতে পারি নি, বং হতেও পারি নি। মনের একটা বোঝাপড়া থাকলে হয়তো হতে পারতাম।...দেখি, কি হয়..."

সুমিত্রার গলা উঠছিল না, জড়িয়ে যাচ্ছিল, কোনো রকমে বলল, 'আপনি চিরকাল আমার ক্ষতি করবেন?"

দেবীদাস এবার কিছুটা বিচলিত বোধ করলেন, ইচ্ছে হল সুমিত্রার সামনে এসে তার মাথায় হাত রেখে দুটো কথা বলেন, কিন্তু তিনি তেমন কিছু করলেন না, মৃদু গলায় বললেন শুধু, "নিজের কাছে মানুষ নিজের ক্ষতি যত করে, অন্যে তা করায় না।...একদিন তুমি আমার কথা খানিকটা বুঝতে পারবে।" দেবীদাস পা বাড়ালেন, বাড়িয়ে আবার কি যেন ভেবে বললেন, "আমি তোমার দিকের বাইরের ক্ষতিটা বুঝতে পারছি। শীতাংশুকে বলো বদলি চাইতে, আমি তাকে বদলি মঞ্জুর করিয়ে দেব।"

পা ফেলে ফেলে কাঁটা-ঝোপের পাশ দিয়ে করবী ঝাড়ের কাছটায় গিয়ে গেলেন দেবীদাস। দাঁড়ালেন। চারপাশে একবার তাকালেন, তারপর স্বাভাবিক পায়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

সুমিত্রা নিস্পন্দ হয়ে বসে ছিল। সে দেবীদাসের চলে যাওয়া দেখছিল ফাঁকা শূন্য চোখে। যেন এই মুহূর্তে দেবীদাস তাকে এমন একটা সমন ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন, যার পর সুমিত্রা কোথাও ভরসা বা আশ্বাস রাখতে পারছে না। সর্বস্বান্ত হবার ভয়ে মানুষ যেমন

হাহাকার করে ওঠে, সুমিত্রার মনে সেই রকম হাহাকার উঠছিল। দেবীদাসকে আরও অমানুষ, হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল সুমিত্রার। অত্যন্ত অক্লেশে তিনি সুমিত্রার পরবর্তী জীবন যেন নষ্ট করে দিয়ে গেলেন।

সুমিত্রা বসে থাকল। একটি অদ্ভুত আবেগ এসে তার চেতনাকে গ্রাস করছিল। এই আবেগ প্রবল ও পুঞ্জীভূত হলে সুমিত্রা ভাবল: সে কি তার স্বামীকে ভালবাসে না? তার বিবাহিত জীবন কি কলুষিত? তার প্রেমের কোথাও কি ছলনা বা ফাঁকি ছিল? সে কি স্বামীর প্রতি আন্তরিক নয়? শীতাংশুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মধ্যে কি সে কোথাও অ-সততার আশ্রয় নিয়েছে?

না, সুমিত্রা মাথা নেড়ে নেড়ে বলল: না, না, না। স্বামীকে সে ভালবাসে, বিবাহিত জীবনে সে কলুষিত নয়, তার এই বিবাহিত প্রেম বড় সাধারণ কিন্তু সেখানে ছলনা নেই। সে আন্তরিকভাবে বাঁচতে চেয়েছে, সে স্বামীর সঙ্গে কোথাও কোনো শঠতা করে নি।

সুমিত্রা যেন জোর করে কোনো বিরুদ্ধ অভিযোগকে দমন করছিল।

কণ্ঠনালী টনটন করে, গলা বুজে কান্না এসে গিয়েছিল সুমিত্রার জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে দেবীদাস অনেকটা চলে গেছেন। উনি চলে গেছেন এই অনুভূতি এখন অনেকটা যেন স্বস্তির মতন লাগছিল।

দেবীদাসকে যখন আর দেখা গেল না, তখনও সুমিত্রা মাটিতে বসে। উনি আড়ালে চলে গেলে সুমিত্রা হঠাৎ ভাবল, সে শীতাংশুকে দিয়ে বদলির দরখাস্ত লিখিয়ে নিতে পারবে। স্ত্রীর শান্তির জন্যে শীতাংশুকে যদি কোনো দুঃখ নিয়ে চলে যেতে হয় যাবে। এ-দুঃখ এমন কিছু নয়।

১৩

বিকেল-শেষে ধুলোর ঝড় উঠেছিল, ঝড়ের দিকে তাকালে না-আকাশ না-গাছপালা চেনা যাচ্ছিল, ধুলোর ঘন আবরণে পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল চারপাশ। তারপর ধূলিঝড় কেটে গেল, সামান্য ঘোলাটে হয়ে থাকল শূন্যতা, আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। সন্ধ্যের গোড়ায় আকাশ কালো হল, জ্যোৎস্না ফুটল না। বৃষ্টি হবে কি না বোঝা যাচ্ছিল না ঠিক, কখনও বৃষ্টি আসার মতন হঠাৎ ভীষণ এক গুমোট হচ্ছিল, কখনও বিদ্যুত চমকে মেঘ ডেকে যাচ্ছিল, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল না। শেষে ঠাণ্ডা বাতাস এল দমকা, হুহু করে দূর থেকে, সেই বাতাস আসতে দেখে বোঝা গেল দূরে কোথাও বৃষ্টি নেমে গেছে, হয়তো আরও একটু বেশী রাত থেকে এখানে বৃষ্টি নামবে।

বৃষ্টি নামার দেরী আছে বলেই যেন আকাশ থেকে বড় বড় কয়েক ফোঁটা জল পড়ছিল, তাতে শুকনো রুক্ষ মাটি এবং দগ্ধ বনবৃক্ষ-লতাপাতা গন্ধময় হল, এই গন্ধ দিয়ে তারা বুঝি বৃষ্টিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল।

বারান্দায় দেবীদাস ও রমলা বসেছিলেন। রমলা বেতের হেলানো চেয়ারে বসে, দেবীদাস পাশে, ডেক চেয়ারে শুয়েছিলেন। ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল বারান্দায়, কখনো দমকা, কখনো এলোমেলো। বারান্দার বাতি নেবানো, সামনে স্থির অন্ধকার ; নিবিড় কোনো গন্ধ রয়েছে বাতাসে।

দেবীদাস বললেন, "তুমি নিজের জীবন থেকেই বুঝতে পার, মানুষের সব কাজ তার নিজের হাতধরা নয়। অনেক সময় আমরা যা ভাবি না, যা কোথাও দেখতে পাচ্ছি না, তাও হয়ে যায় হঠাৎ।"

রমলা কোনো সাড়া দিল না। দেবীদাসের কথা স্বীকার না

করার কিছুই নেই। বাবা কাশীর গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ভেসে যাবেন এ কি তারা কেউ আগে দেখেছিল? সে কি কোনোদিন জেনেছিল মুঙ্গেরে এসে সে লালিত পালিত হবে? নাকি পুষ্করে মা একা একা মারা যাবে?…ভাগ্য! ভাগ্য যে কি রমলা জানে না, কিন্তু এই ভাগ্য মানুষের কোনো না-জানা-ঘটনা; না ঘটা পর্যন্ত জানা যায় না।

দেবীদাস বললেন, "সুমিত্রার দিদিব সঙ্গে আমার খুবই মেলামেশা ছিল এটা সত্যি কথা।…কেন মেলামেশা হয়েছিল তাও তুমি বুঝতে পার।"

বুঝতে পারে বইকি রমলা। সুমিত্রাদের পরিবারের যেটুকু পরিচয় সে শুনল এতক্ষণ, দেবীদাসই সংক্ষেপে বললেন আজ, তাতে সে বেশ বুঝতে পারছে, সুমিত্রাদের পুরো সংসারটাই দেবীদাসকে ফুলচন্দন দিয়ে বাড়িতে ডেকে নিয়েছিল। কেনই বা নেবে না! ছেলে হিসেবে উনি তখন শুধু সুপাত্র নন, আশাতীত সৎপাত্র। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র ছেলে। সুনাম সুযশ ছড়িয়েছে সদ্যসদ্য, আর সুমিত্রার দিদি তো তখন সবে কলেজের বি-এ ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসেছে। দেবীদাসের সঙ্গে অতিদূর একটা সম্পর্ক ছিল সুমিত্রার মা'র, সেটা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়, তবু এই সম্পর্কটা একটা সূত্র হল, সুযোগ হল। সুমিত্রার মা কোনোরকম দ্বিধা করলেন না, বড় মেয়েকে নিয়ে বড় আশার মুখ দেখতে বসলেন।

"অঞ্জলি দেখতে সুশ্রী ছিল, সুন্দরী কি না—আমি ঠিক বলতে পারব না। আমি অত বুঝতাম না। তবে ওকে দেখতে ভাল লাগত।" দেবীদাস বলতে শুরু করে কথার মধ্যে থামলেন, হাতে সিগারেট ছিল, লাইটারের শিখায় জ্বালিয়ে নিলেন, বললেন, "তোমার কি সেই বাঁকিপুরের মধুবাবুর কথা মনে আছে? মধুবাবুর স্ত্রীর মতনই অনেকটা দেখতে ছিল অঞ্জলি, ওই রকম গড়ন-টড়ন।"

মধুবাবুর স্ত্রীকে মনে পড়ল রমলার। নীলিমা। কোনো কোনো

মেয়ের চেহারায় এক ধরনের ছলছলে ভাব থাকে, পুরুষের চোখ সহজেই তারা টেনে নেয়। ঠিক যে কেন নেয় বোঝা মুশকিল, তবে সৌন্দর্যের জন্যে নয়; হয়তো তাদের চালচলনে একটু বেশী রকম সপ্রতিভতা আছে, শরীরের মতন স্বভাবটাও ওপর-গড়ানো। নীলিমার মতনই যদি হয় অঞ্জলি, তবে রমলার চেয়ে সুন্দরী সে ছিল না। দেবীদাস কি কথা প্রসঙ্গে রমলাকে তা বুঝিয়ে দিলেন?

দেবীদাস সিগারেটের ধোঁয়া গলায় নিয়ে বললেন, "অঞ্জলির সঙ্গে আমার মেলামেশা খুবই হয়েছিল, কিন্তু তখনও তাকে আমি বিয়ে করব কি না তা ভেবে উঠতে পারি নি। আমার তখন ঠিক সংসার করার মতন অবস্থা নয়, দাদা খুবই অসুস্থ, বউদি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কলকাতায় আমার আশ্রয়ে। চাকরি যা করতাম সেটা সম্মানের হয়তো, কিন্তু মাইনেপত্র সামান্য।···তা ছাড়া যেটা বড় কথা, অঞ্জলি খানিকটা অন্য স্বভাবের মেয়ে ছিল। আমাকে তার প্রথম প্রথম যতটা পছন্দ ছিল, পরে আর তত ছিল না।"

রমলা কান পেতে প্রত্যেকটি কথা শুনছিল। দেবীদাসের গলার স্বর গভীর, আন্তরিক। বহুদূরের কিছু স্পষ্ট, কিছু অস্পষ্ট স্মৃতি ঘাঁটতে ঘাঁটতে তিনি কথা বলছেন, বলার ধরনটা সাদামাটা, কিন্তু সরল সত্যের মতন বিশ্বাস্য।

দেবীদাস অঞ্জলির স্বভাবের কথা অগোছালোভাবে মনে করছিলেন। অঞ্জলি যে প্রথমে একরকম ছিল, পরে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। দেবীদাসকে ঠিক কিভাবে অঞ্জলি গ্রহণ করেছিল, দেবীদাস পরে বুঝতে পেরেছিলেন। আমরা অনেক সময় যা চাই সেটা নিজের আনন্দের জন্যে ততটা নয় যতটা আত্মতৃপ্তি বা অহংকারের জন্যে। খুব সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে অনেক সময় অনেকেই যে সে সৌন্দর্যে নিজে আলাদা কোনো সুখশান্তি পেয়েছে তা নয়, স্ত্রীর সৌন্দর্য তার একটা অহংকারের বিষয় হয়েছে। সৌন্দর্যকে ভালবাসা, কিংবা সেই ভালবাসাকে ধরে রাখার মতন মন

কম, খুবই কম, কিন্তু অহংকারকে দেখানো সহজ। আভিজাত্য কি প্রতিষ্ঠাও ওই রকম, অনেকটা অহংকারের বিষয়। অঞ্জলি যখন দেবীদাসকে ঘনিষ্ঠ করে নিয়েছিল, তখন তার মনে সেই অহংকারটাই ছিল প্রবল। ভালবাসা হয়তো ছিল কিছু, তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল অহংকার, গর্ব; যেন অঞ্জলি সংসারের অন্য পাঁচজনকে দেখাতে চাইত: দেখ, কী রকম ছেলের সঙ্গে আমার ভালবাসাবাসি, ওরকম হীরের টুকরো ছেলে, প্রতিভাবান পুরুষ আমার প্রেমিক। খুব সুন্দর ও দামী কোনো গয়না গলায় থাকলে মেয়েরা যেমন একদিকে নিজে মুগ্ধ হয় ও অন্যদিকে পাঁচজনকে দেখিয়ে সুখ পায়—দেবীদাসকে অঞ্জলি প্রথম প্রথম সেইভাবে দেখাতে চেয়েছিল। দেখাবার কারণও ছিল, কেননা অঞ্জলিদের পরিবারের পক্ষে দেবীদাসের মতন ছেলে অপ্রত্যাশিত, অঞ্জলির পক্ষে তো বটেই।

দেবীদাস বললেন, "মানুষের স্বভাব নিয়ে জোর করে কিছু বলা যায় না, তবে আমার সেদিন মনে হয়েছিল, অঞ্জলির কাছে আমি আমার সুনাম সুখ্যাতির জন্যে মূল্যবান। সে বার বার বলত, আমি জিনিআস। জিনিআস আমি ছিলাম না, প্রশংসা করে যাঁরা আমায় জিনিআস বলতেন তাঁরা ছিলেন আমার শিক্ষক; স্নেহ করে বলতেন। আমি বিদেশে একটা চাকরি পেয়েছিলাম সেই বয়সে, ওটা আমার সৌভাগ্য হতে পারে—কিন্তু তার মধ্যে আমার প্রতিভার কিছু প্রকাশ পাচ্ছে না। সে-চাকুরি আমি নিই নি, নানা কারণ ছিল না নেবার; দাদার অসুখ, সংসারের দায়দায়িত্ব, তা ছাড়া আরও অনেক কারণ ছিল। দেশ ছেড়ে যাবার ইচ্ছেও আমার ছিল না। নিজের সম্পর্কে আমার মোটামুটি একটা গর্ব ছিল, তার বেশী কিছু না। আমি সেদিনও জানতাম আমার যা বিদ্যে তাতে মাঝারি একটা চাকরি জুটতে পারে কলেজ-টলেজে, তার বেশী কিছু না। বড় জোর আমার বিদ্যের যারা ব্যাপারী, তারা হয়তো আমায় একটু সম্মান দেবে। অঞ্জলি আমায় তার অহংকারের বস্তু করে নিয়েছিল, তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব

ভাবত, আমি একজন অসাধারণ কিছু। অনেক সময় অঞ্জলি অন্যের কাছে মিথ্যে কথা বলত আমাকে নিয়ে, আমার দাম বাড়াত, আমার খাতির চড়িয়ে দিত। অনেকবার সে আমায় অন্যের কাছে লজ্জায় ফেলেছে। এমন এমন কথা বলেছে মনগড়া যে, পরে অন্যের মুখ থেকে শুনে আমি মাথা নীচু করেছি লজ্জায়।···আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার স্বভাবচরিত্র, মন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা এসবের ওপর অঞ্জলির কোনো বিশেষ টান নেই, মমতাও নেই ; সে আমায় তার ভালগার এক স্থখ পাবার উপকরণ করে নিয়েছে। সে কি চাইত জান? চাইত—যেভাবে চলাফেরা করলে, মিথ্যে কথা বললে, ফাঁকা আত্মম্ভরিতা করলে আমার সম্পর্কে একটা মোহ জাগে পাঁচজনের, আমি যেন তেমন আচার-আচরণ করি। আমি তা করতে পারতাম না, করতে আমার ভাল লাগত না।”

রমলা নীরবে শুনছিল। দেবীদাস যা বলছেন তার মধ্যে হয়তো একটু বিনয় আছে, কিন্তু তা বিনয় বলে মনে হয় না। নিজের সম্পর্কে ওঁর ধারণা আজ যা, সেই বয়সেও এতটা নিস্পৃহ ছিল কিনা আজ বলা যায় না। তবে বেশ বোঝা যায়, অঞ্জলি দেবীদাসকে ভালবাসে নি, ভালবাসলে এই যে ক্ষোভ তা দেবীদাসের থাকত না। অঞ্জলি বোধ হয় দেবীদাসকে পাশে রেখে নিজের অহংকারকে লোক-দেখানো স্থখ করে নিয়েছিল। এরকম হয়, মেয়েদের বেলায় খুব বেশী হয়, হওয়া তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আজ এই বয়সে নানা অশান্তি সত্ত্বেও সে-রকম একটা গোপন অহংকার কি দেবীদাসের জন্যে রমলারও নেই?

কথাটা মনে আসতেই রমলা কেমন সঙ্কোচ অনুভব করল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন বিরূপ বিরক্ত চোখে মনে মনে অঞ্জলিকে দেখল। বাঁকিপুরের মধুবাবুর বউ নীলিমার মুখই অঞ্জলি হয়ে ভাসছিল। রমলা মনে মনে যেন তাকে বলল : এ অন্যায় ; তুমি একজনকে ভালবাস বলবে, আর সেই মানুষের যশ খ্যাতি আছে বলে তাকে শুধু নিজের দামী শাড়ি গয়নার মতন লোকদেখানো শোভা করে রাখবে, আর

অহংকারে ফুলবে, তা হয় না। শুধুই তোমার নিজের সুখ স্বার্থ বই সেখানে আর কি আছে ?

দেবীদাস সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অন্ধকারে তাঁকে আরও সমাহিত স্থিতধীর মতন লাগছিল। রমলার মনে হল, দেবীদাস এখন এমন এক অবস্থায় আছেন, যে-অবস্থায় তিনি জীবনের যে কোনো কথাই অক্লেশে বলে যেতে পারেন।

দেবীদাস কথা বললেন আবার: "অঞ্জলির সঙ্গে আমার মনের অমিল দিন দিন বাড়ছিল। আমি যা অপছন্দ করতাম, যা চাইতাম না, যেসব ব্যাপারে আমি স্বভাববশে সরে থাকতে চাইতাম, ও দেখেছি সেগুলোই করত, তাতে তার আনন্দ ছিল। সে আমার সম্পর্কে এমন সব রটনা করেছিল যে, নিজের বাড়িতেও আমি অশান্তি সহ্য করেছি।···তা সে যাই হোক, শেষের দিকে অঞ্জলিও বুঝতে পেরেছিল আমি তার ঠিক মনের মতন সঙ্গী নয়। সে অন্য কোনো কোনো ছেলের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছিল।" দেবীদাস এমন করে কথাগুলো বলছিলেন যে, মনে হচ্ছিল এই ধরনের সম্পর্ক তাঁকে তখন খুবই ক্ষুব্ধ করত, হতাশ করত, তবু তিনি অঞ্জলির মোহ ত্যাগ করতে পারেন নি। "···একটা জিনিস সব মানুষই বুঝতে পারে, আমি অঞ্জলির ভাবগতিক দেখে বুঝতে পারতাম, আমার সম্পর্কে তার ভেতরের উৎসাহ মরে আসছে। নিজের বাড়িতে সে সেটা জানাতে চাইত না, কিন্তু জানতে আমার কষ্ট হয় নি।···তুমি একে অঞ্জলির মন-বদলে ফেলাও বলতে পার, আবার এও বলতে পার, অঞ্জলি আমার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছিল। আমি ঠিক তার মনোমতন হতে পারলাম না, এতে তার উৎসাহ আর থাকল না।" দেবীদাসের কথা থেকে রমলা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল তিনি যেন বলতে চান: অঞ্জলি তাঁকে তার প্রয়োজনেই নিয়েছিল, প্রয়োজনেই ব্যবহার করত, আবার যখন একেবারে না সরিয়ে পাশে রেখেছিল, তখনও সে প্রয়োজন বুঝেই রেখেছিল।

দেবীদাস বলতে বলতে থামলেন একটু। কয়েকবার নিশ্বাস নিলেন, হয়তো এ-সময় তাঁর মনের কোথাও কোনোরকম বিষণ্ণতা এসেছিল, রমলা যেন ওঁর নিশ্বাসের শব্দ পেল এই প্রথম।

নীরবতার মধ্যে হঠাৎ দেবীদাস কেমন আত্মধিক্কারের গলায় বললেন, "আমি তখন বয়স-দোষে একটা বোকামি করেছি। আমার উচিত ছিল অঞ্জলিদের বাড়ি থেকে চলে আসা, সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া। আমি তা পারি নি। কেন পারি নি আমায় যদি জিজ্ঞেস কর, আমি তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারব না। এক একটা সময় মানুষের কেমন হয় জানো? সে জেদ করে তার নিজের সর্বনাশ নিজেই দেখতে চায়। মহাভারতের দুর্যোধন যেমন করেছিল। এ-রকম বোকামির কোনো মানে নেই, যুক্তি নেই; তবু মানুষেই এটা করে। আমিও করেছিলাম।"

রমলা বুকের মধ্যে স্পন্দন অনুভব করল। স্নায়ুগুলি ঈষৎ যেন জ্বালা করে টানটান হয়ে উঠল। বাইরে যতদূর চেয়ে থাক—অন্ধকার; বাদলা বাতাস এল মুখের ওপর দমকা, নিশ্বাস নিতে কেমন কষ্ট অনুভব করল রমলা।

দেবীদাস কিছু সময় নির্বাক হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। যেন খুব স্থির ও নিশ্চিত হয়ে তিনি কোনো ক্ষত দেখে নিচ্ছেন, তারপর আর বৃথা বিলম্ব না করে ছুরির ফলা তুলে নিলেন। একটু চাপা, খসখসে গলায় কথা শুরু করলেন, ক্রমে তাঁর গলার স্বর স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

"সুমিত্রার তখন অল্প বয়স, বছর ষোলো সতেরো হবে", দেবীদাস বলছিলেন, "ওর স্বভাব ছিল চাপা, খুব চাপা, ওপর থেকে মনে হতো তার কোনো দিকে চোখ নেই, কিন্তু সে চুপ করে সব চেয়ে চেয়ে দেখত। আমি অবাক হয়ে দেখতাম, ওই বয়সেই কী রকম শান্ত শিষ্ট। বাড়িতে খুব একটা কথাবার্তা বলতে বা হইচই করতে দেখতাম না।"

সেই বয়সের সুমিত্রাকে দেবীদাসের মনে পড়ছিল। জীবনের

একটি ঋতু শেষ করে সদ্য অন্য ঋতুতে পা দিয়েছে সে। যৌবনের শ্রী ও কোমলতা এসেছে সর্বাঙ্গে, বসন্তের সকালবেলার রৌদ্রের মতন আভা লেগেছে শরীরে, কিসের যেন এক মাধুর্য ও আকর্ষণ ছিল সুমিত্রার সুশ্রী মুখে, চোখে, কপালে, চুলে; তার হাঁটার ভঙ্গি, তার কথা বলার ধরন, দৃষ্টি, হাসি, চোখের পাতা নামিয়ে নীচু মুখে সামনে দাঁড়ানো—এ-সব এবং আরও কত কি সুমিত্রাকে সুন্দর করে তুলেছিল। মনে হতো, সুমিত্রার চারপাশে যেন সৌরভ ও আকর্ষণ আছে, মুগ্ধ ও প্রসন্ন হবার মতন এক মণ্ডল।

দেবীদাস কখন যেন আরও একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছিলেন, বললেন, "এক একটা অবস্থার মধ্যে এক এক জিনিসের এক ধরনের চেহারা ফুটে ওঠে। কথাটা ঠিক তোমায় বোঝাতে পারলাম না—আসলে কি জানো, সংসারে সব জিনিসের একটা সাধারণ চেহারা আছে, আমাদের এই বাড়ি, সামনের ওই বাগান, দূরের মাঠঘাট—সব সময় এদের দেখছি, সাধারণ সাদামাটা লাগছে; কিন্তু হঠাৎ যদি এখন খুব খানিকটা বৃষ্টি হয়ে মেঘ কেটে ফুটফুটে জ্যোৎস্না ওঠে, তোমার চোখে এই বাগান হঠাৎ অন্যরকম এক চেহারা নিয়ে দেখা দেবে। মানুষের জীবনেও এ-রকম ঘটে, বিশেষ এক অবস্থার মধ্যে তার আর-এক চেহারা ফুটে ওঠে···অঞ্জলির ব্যাপারে আমি যখন একেবারে বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ, হতাশ, তখন সুমিত্রা আমায় কেমন আকর্ষণ করতে শুরু করেছিল।"···দেবীদাস থামলেন। শত হলেও তিনি যেন এখন সুমিত্রার প্রতি তাঁর আকর্ষণের কারণ খোলাখুলি বলতে সঙ্কোচ অনুভব করছিলেন। সামান্য ইতস্তত করে বললেন, "তোমার কাছে খুঁটিনাটি করে সব কথা বলার দরকার হবে না—তুমি বুঝতেই পারছ, একটা জায়গায় যখন বিশ্রী রকমের অশান্তি, বিরক্তি ভোগ করছি, নিজেকে কেমন হেরে যাওয়ার মতন লাগছে, তখন ঠিক সেই একই বাড়িতে যদি এমন একটি মেয়েকে আমার চোখে পড়ে, যে সদ্য সুন্দর হয়ে উঠেছে, মেয়েদের সবচেয়ে—সবচেয়ে অ্যাট্রাকটিভ বয়সে পা

রেখেছে, তবে আমার মতন রক্তমাংসের মানুষ সেই মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে কি করবে!···এর জন্যে নিজেকে আমি বোকা বলব না, আসলে বোকামির চেয়েও অনেক হীন কাজ আমি করেছি।”

রমলা কেমন দুরু দুরু বুক নিয়ে শুনছিল। দেবীদাস যা বলতে চাইছেন, সে বুঝতে পারছে। অঞ্জলির সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি দেবীদাসের, চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নি; ব্যর্থ হয়েছিলেন; এবং ব্যর্থ হয়েই নিজের দুর্বলতায় নিজেই জড়িয়ে পড়েছিলেন।

দেবীদাস কি বস্তু চেয়েছিলেন অঞ্জলির কাছে, রমলা অনুভব করতে পারছিল; অঞ্জলির কাছে তিনি যথার্থ ভালবাসা চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন অঞ্জলি অন্য দশজন প্রেমিক-প্রেমিকার মতন দেবীদাসের হৃদয় মন সত্তাকে গ্রহণ করুক, ভালবাসুক। যদি এমন হয়, কোনো মেয়ে কোনো পুরুষের প্রতিভার জেল্লা, নামের জেল্লা বা টাকার জেল্লা ভালবাসে, তবে সেই পুরুষের এই গ্লানি নিশ্চয় থাকবে যে, মেয়েটি মানুষ হিসেবে তাকে নেয় নি। দেবীদাস দেখতেন তাঁর নিজের কোনো মূল্য নেই অঞ্জলির কাছে, এইটেই তাঁর ক্ষোভের ও দুঃখের কারণ হয়েছিল, মনে হতো হেরে গেছেন কোথাও। আর সুমিত্রার যৌবনাগমনই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, হয়তো সুমিত্রার সেই বয়সের কুণ্ঠা, সলজ্জ সম্পর্ক, গোপন স্বভাবের ওপর তাঁর আকর্ষণ জন্মেছিল।

গলা ভর্তি করে বার কয়েক ধোঁয়া নিলেন দেবীদাস। পরে মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগলেন, “আমার তখন বয়েস হয়েছিল, বছর পঁয়ত্রিশ। সেই বয়সে আমার উচিত ছিল বোকামি না করার, কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে কাজ করার। কিন্তু আমি তা করতে পারি নি। সুমিত্রার দিকে যেন খানিকটা ঝুঁকে পড়েছিলাম। দেখতাম, ওর বয়স কম কিন্তু মন সে তুলনায় বয়স্ক; অনেক বেশী বোঝে। ওদের বাড়ির দোষে সুমিত্রা ওইরকম হয়েছিল; যা ওর বয়সে না বুঝলেও চলে, সেসব ওর সমস্তই জানা হয়ে গিয়েছিল। সুমিত্রা

আমাকে কোনোরকম দ্বিধা করার সুযোগ দেয় নি। বরং তার চাপা স্বভাবের মধ্যে যে বাসনা লুকিয়ে ছিল, আমি আস্তে আস্তে তাও জানতে পারলাম।”

পূর্বস্মৃতির কয়েকটি টুকরো দৃশ্য দেবীদাস মনের পটে ভেসে উঠতে দেখলেন। দৃশ্যগুলি অবশ্য নিবে-আসা নক্ষত্রের মতন অতি দূরান্তে বিরাজ করছিল, যা স্বতন্ত্রভাবে দেখা যায় না, ছায়াপথের মতন মনে হয়। তবু ওর মধ্যে থেকে কিছু মনে পড়ল। তাঁর মনে পড়ল, তিনি অঞ্জলিদের বাড়ি থেকে ফিরছেন, সুমিত্রা তাঁকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে বলছে: ‘কাল আসবেন তো?’ বলে অন্ধকারে একপাশে দরজার পাল্লায় হেলে দাঁড়িয়ে আছে। দেবীদাস বললেন, ‘না, কাল আসতে পারছি না, তিন চার দিন পরে আসব। তোমার দিদিকে বলো। তার দেখা পাওয়াই মুশকিল।’...সুমিত্রা কি যেন বলব বলব করে শেষে বলল: ‘দিদি ছাড়া যেন মানুষ নেই বাড়িতে।...না, কাল আসবেন; আসতেই হবে।’ বলে অন্ধকারেই এমন করে মাথা বেঁকিয়ে নিল, মনে হল, সে এখন থেকে কাল পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত দেবীদাসের অপেক্ষায় থাকবে। দেবীদাস চলে আসতেন, কিন্তু জানতেন আগামীকাল আবার তিনি যাবেন। সুমিত্রার মাও চাইতেন এই আসা-যাওয়া যেন বন্ধ না হয় ওবাড়িতে; বড় মেয়ের স্বার্থ বুঝে তিনি দেবীদাসেব জন্যে সদর খুলে রেখেছিলেন।

সুমিত্রা শুধু আসতে বলত না, এলে দেবীদাসকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাত, গল্প করত; সে-সব গল্পের কোনো কোনোটা একটু যেন বিসদৃশ লাগত দেবীদাসের, কিন্তু তিনি তেমন ক্ষুণ্ণ হতেন না।... অঞ্জলিকে তখন বাড়িতে বড় একটা পাওয়া যেত না। সুমিত্রাই সঙ্গ দান করত। বরং অঞ্জলির চেয়ে সুমিত্রার সঙ্গলাভে সুখ ছিল। সুমিত্রা চাইত এই সঙ্গদান যেন মধুর হয়, সৌরভপূর্ণ হয়। সে ছেলেমানুষ ছিল, কিন্তু অবোধ ছিল না। স্বাভাবিক নারীজনোচিত চাতুর্যগুলি সে ব্যবহার করতে পারত।...কখনও কখনও সুমিত্রা

কোথাও যেতে চাইত দেবীদাসের সঙ্গে, কখনও কেমন এক অলস মুগ্ধ চোখ করে দেবীদাসের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলত: 'আপনার আজকাল খুব পা ভারী হয়েছে; হবেই তো, বিদ্বান মানুষ, আমরা সব কি না কি!' এটা অবশ্য ছেলেমানুষী, কিন্তু ছেলেমানুষী মুখের কথায়; চোখে নয়, মনেও নয়। একদিন বর্ষাকালে দেবীদাসের ভিজে মাথা মুছিয়ে দিয়েছিল সুমিত্রা, দিয়ে চুল পর্যন্ত আঁচড়ে দিয়েছিল। আর-একদিন বুক পকেটে একটি গোলাপ ফুল দিয়ে বলেছিল: 'দেখবেন, বাড়ি গিয়ে পকেটে নাক ঠেকিয়ে দেখবেন কি রকম গন্ধ হয়ে গিয়েছে, মশাই।' আরও একদিনেব কথা মনে পড়ল দেবীদাসের। গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে গিয়েছিল সুমিত্রা, আউটরাম ঘাটের কাছে বসে, বিকেল যখন ফুরোচ্ছে—টিপটিপ বৃষ্টি এল, মাথায় কাপড় তুলে দিল সুমিত্রা ঘোমটার মতন করে। তারপর হঠাৎ হেসে বলল, 'কেমন দেখাচ্ছে বলুন তো।'

সম্পর্কটা সরল ও ছেলেমানুষী থেকে দেখতে দেখতে কেমন জটিল হয়ে যাচ্ছিল। সুমিত্রার মা নাকি ঠোঁট টিপে হাসতেন, আড়ালে বলতেন: ছোট বোনের মতন শালী, একটু আদর আব্দার করবে বইকি। অঞ্জলি বলত: 'তোমারই তো লাভ, সুমির মুখের ওপর তোমার না একটু টান ছিল।'

রঙ্গ রসিকতা একেবারে অপছন্দ করার মতন মন ছিল না দেবীদাসের, বিশেষ করে সুমিত্রার বেলায়। কিন্তু ক্রমে যে অবস্থা ঘটল, তাতে দেবীদাস বিচলিত হলেন।

রমলা অপেক্ষা করে ছিল, উৎকর্ণ হয়ে ছিল। দেবীদাস অন্য-মনস্কতা কাটিয়ে এবার বললেন, "তোমার কাছে আমি কিছু লুকোবো না। আমি তখন সুমিত্রাকে যে প্রশ্রয় দিতাম, তার একটা সভ্য অর্থ নিজের কাছে নিজেই দিয়েছি। কিন্তু তা নয়, আমি বাইরে যে-রকম আচরণই করি না কেন, ভেতরে সুমিত্রার ওপর দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম। আগে এক সময় ওর হাত ধরেছি, কাঁধে-মাথায় হাত

রেখেছি নিজের, মুখের পাশে যখন ও ঝুঁকে পড়েছে নিশ্বাস গালে লাগলে কিছু তফাত বুঝি নি। কিন্তু এখন এমন হল, ওরই হাত ছুঁলে আমার কেমন যেন লাগত, গা স্পর্শ করলে মনে হত হাত যেন গরম হয়ে উঠেছে, ওর চুলের গন্ধ, মুখের গন্ধ, নিশ্বাস আমায় পুড়িয়ে দিত। ···সুমিত্রা যে আমায় ভালবেসে ফেলেছে এটা স্পষ্ট করে বুঝলাম এক দিনের এক অদ্ভুত ঘটনায়। সময়টা তখন ডিসেম্বর মাস, বড়দিনের ছুটি চলছে, আমি দু চার দিনের জন্যে দেশের বাড়িতে যাচ্ছি। সুটকেশ গুছোচ্ছিলাম, দাদা মারা যাবার পর বউদি আর বাচ্চাকাচ্চারা সেই যে দেশের বাড়িতে ফিরে গেছে, তারপর আর তাদের কোনো ব্যবস্থা করে আসা হয় নি।···শীতের সেই মরা বিকেলে সুমিত্রা আমার বাড়িতে এসে হাজির। ওর চোখ-মুখ দেখে মনে হল কি যেন একটা ঘটেছে, রুক্ষ উস্কোখুস্কো চেহারা, বেশ উত্তেজিত। অঞ্জলির তখন অসুখবিসুখ চলছিল। ভয় পেয়ে বললাম, কি হয়েছে ?”

দেবীদাস থামলেন, যেন এখানে একটু বিরতি না দিয়ে পারলেন না। তিনি হঠাৎ কোনো রকম কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ অনুভব করে ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন, “সুমিত্রা যা বলল, শুনে আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গিয়েছিল। আমি ভাবতেই পারি নি এমন হতে পারে। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলে যেমন হয়, সেইরকম হল। অঞ্জলির অসুখটা যে এমন নোংরা ধরনের হবে কে জানত···!” দেবীদাস থেমে গেলেন আচমকা।

বুকের তলা থেকে যেন অদ্ভুত আঁকশির মতন কি-একটা জিনিস উঠে রমলার আলজিবের কাছের সমস্ত মাংসপিণ্ড টেনে ধরল। বুক ধক ধক করছিল। স্বামীর দিকে মুখ ফেরাল রমলা ! অন্ধকারে দেবীদাসের চোখ, মুখ, নাক কিছুই আলাদা করে দেখা যাচ্ছিল না।

“বাচ্চাকাচ্চা হবার অসুখ—?” রমলা নিশ্বাস বন্ধ করে খুব চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, সুমিত্রা সেইরকম বলল।"

"কি করে ?"

দেবীদাস অন্ধকারে মাথা তুললেন। সামনের স্থির ও বিস্তৃত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে যেন তিনি সেদিনের দৃশ্যটি দেখতে দেখতে বললেন, "আমি জানতাম না।···সুমিত্রা বলল, তার মা আমার কথা ভাবছে, তার দিদি মুখ বুজে রয়েছে।" একটু যেন ভাঙা ভাঙা শোনাল দেবীদাসের গলার স্বর, থামলেন দু মুহূর্ত, বললেন, "দিদির অসুখের কারণটা জেনে সুমিত্রা আমার কাছে ছুটে এসেছিল কেন ? মনে হবে কোথাও কোনো একটু সন্দেহ কিংবা দ্বিধা মুছে ফেলতে। আমি তখন সে-রকমই ভেবেছিলাম । তাকে বললাম, আমার সঙ্গে ও-ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি কিছু জানি না।"

রমলার আলজিবের কাছে এতক্ষণ যে আঁকশির টান ছিল, তা যেন খুলে গেল। গলার কাছে শক্ত আঁট ভাবটা নরম হলে সে দীর্ঘ করে শ্বাস নিল।

দেবীদাস বললেন, "সেদিন আমার ঘরে বিছানায় বসে সুমিত্রা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। আমি ভেবেছিলাম, দুঃখে কাঁদছে। পরে তার কথা থেকে বুঝলাম, আমায় কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারল না জেনে সে স্বস্তি পেয়ে সুখে কাঁদছে।"

রমলা কল্পনায় সেদিনের সুমিত্রার কান্না এবং দেবীদাসের বিমূঢ় অবস্থাটা যেন দেখছিল। ভালবাসা ? সুমিত্রা তবে দেবীদাসকে ভালবেসেছিল ? আশ্চর্য ! রমলা অনেক ভেবেছে, অনেক রকম সন্দেহ এসেছে তার মনে, কিন্তু এ-রকম তার কখনও মনে হয় নি দেবীদাস এবং সুমিত্রার মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক থাকতে পারে। ভালবাসার সম্পর্ক থেকে এ-রকম তিক্ততা, ভীতি কি সম্ভব ! রমলারও কখনও মনে হয় নি এই গোপনতার কোথাও ভালবাসার কোনো সম্পর্ক আছে। কেন যেন রমলা আশ্চর্য এক মমতা ও স্নিগ্ধ স্নেহ অনুভব করল সুমিত্রার ওপর। প্রথম যৌবনের প্রথম ভালবাসা।

বোকার মতন, সংসারের সাত-পাঁচ ভালমন্দ না বুঝে, মাটির দিকে না তাকিয়ে, আকাশ-মুখ করে ভালবাসা! নিজের জীবনে কি এই ভালবাসা কখনও অনুভব করেছিল রমলা? শিরীষদাকে কি ঠিক ওইভাবে ওই বয়সে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়েছিল রমলার?

"তোমায় খুব ভালবেসেছিল সুমিত্রা।" রমলা নিশ্বাসের সুরে বলল, বিন্দুমাত্র তিক্ততা ছিল না তার গলায়।

"হ্যাঁ, খুব ভালবেসেছিল..." দেবীদাস টেনে টেনে বললেন, "আমিও তখন তাই ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম বলেই আমি নিজের বয়সের কথা ভাবি নি, সুমিত্রার বয়সের কথা ভাবি নি, জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক আমার লোপ পেয়েছিল।" দেবীদাস উত্তেজিত হয়েছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন তিনি তাঁর গাম্ভীর্য, সংযম, সম্ভ্রমবোধ সব অক্লেশে সরিয়ে রেখে একেবারে সাদামাটা কাতর মানুষ হয়ে গেছেন। দেবীদাস বলছিলেন: সুমিত্রার মাকে অসম্মান করে কথা বলেছি, অঞ্জলিকে যা ভেবেছি তা তুমি বুঝতেই পার।...আমার কোথাও কোনো আক্রোশ লুকোনো ছিল জন্তুর মতন, দুঃখ ছিল, রাগ ছিল। সুমিত্রাকে আমার সেই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার মধ্যে এত সহজে নিজের আয়ত্তের মধ্যে পেলাম যে, আমি কোনো কিছু বিচার করি নি। সবরকম সুযোগ আমি নিয়েছি। যা যা নেওয়া সম্ভব, সব।

রমলার যেন কি একটা প্রশ্ন এসেছিল মুখে, বলতে গিয়ে বলতে পারল না। দেবীদাসের কথা বলার ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছিল, সুমিত্রাকে তিনি ভালবাসেন নি, অথচ...অথচ...

দেবীদাস হঠাৎ বললেন, "আমার অন্যায়ের সীমা নেই। সত্যি-মিথ্যে জানার সামান্য ধৈর্য পর্যন্ত আমার হয় নি। সুমিত্রার কথা বিশ্বাস করে আমি যা করেছি, সবই পশুর মতন, কিন্তু মানুষের মতন কিছু করি নি। অঞ্জলি আমায় ভালবাসুক না বাসুক অন্য কথা. কিন্তু অঞ্জলির অসুখটা সত্যিই তো নোংরা ছিল না।"

রমলা চমকে উঠল। পিঠ তুলে সোজা হয়ে বসতে বসতে সে দেবীদাসের দিকে অপলকে তাকাল।

"পেটের যক্ষ্মা রোগে ধরেছিল অঞ্জলিকে। বেচারী!…কিন্তু ততদিনে আমার সঙ্গে ওবাড়ির সম্পর্ক চুকে গেছে। সুমিত্রাই যা আসা-যাওয়া করত আমার কাছে।…যেদিন আমি জানতে পারলাম, সুমিত্রা তার দিদির কাছ থেকে বরাবরের মতন আমায় তার সম্পত্তি করে নেবার জন্যে সবচেয়ে কুৎসিত চালাকি করেছিল, সেদিন আমি ওকে কি না করেছি! এমন করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম যা কেউ দেয় না। এমন কি আমি ওর গায়ে হাত তুলেছিলাম। আমি ইতর, বর্বর, অসভ্য হয়ে গিয়েছিলাম তখন।"

রমলা হতচেতন হয়ে বসে থাকল। মনে হল না সে নিশ্বাস নিতে পারছে, কোনো কিছু অনুভব করতে পারছে। নিস্পন্দ হয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ আর দেবীদাস কথা বললেন না, যেন সেই কুৎসিত নোংরা ইতিবৃত্ত উদ্ঘাটন করে দিয়ে তিনি রমলাকে ভাল করে সব দেখতে ও বুঝতে দিচ্ছেন। শেষে সামান্য ক্লান্ত স্বরে দেবীদাস বললেন, "আমি সুমিত্রার দিকে আঙুল দেখিয়ে সব দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে নিজের জন্যে সাফাই গাইছি না, রমলা। সুমিত্রা যে বয়সে এ-রকম কাজ করেছিল সেই বয়সটা বোকামির বয়স ; ওর দিদি ওর মনের মধ্যে একটা বিশ্রী মোহ সৃষ্টি করেছিল আমার সম্পর্কে, আমায় লাভ করতে পারাই সুমিত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল। সুমিত্রা আমায় বলত, দিদির মুখে শুনে শুনে সে প্রথমে আমায় ভালবাসতে শুরু করেছিল। ওটা এক রকম অবসেসান হয়তো। কী জানি ওরা দু' বোনই কেমন দু-রকম মিথ্যের মধ্যে নেমেছিল। শেষ পর্যন্ত সে যা করেছে তা খুব নোংরা, নিষ্ঠুরের মতন কাজ, অত্যন্ত হীন ব্যাপার। কিন্তু ও-বয়সের বোকামির, বাসনার, বোধহীন স্বার্থের, এমন কি পাপেরও একটা ক্ষমা আছে। আমি, আমার ক্ষমা পাবার যুক্তি

কোথায় ? আমি কি করে আমার বয়স, বিদ্যে, বুদ্ধি, সভ্য-বোধ, বিবেক ভুলে গিয়েছিলাম ?···এর কোনো যুক্তি সত্যি সত্যিই নেই। যা আছে, তুমি তা বোঝ।"

রমলা স্তব্ধ। অন্ধকারেও দেবীদাসের অনেকখানি যেন দেখতে পাচ্ছিল রমলা। সেদিনের সেই অন্যায়ের লজ্জা, গ্লানি, ক্ষোভ আজও যেন তাঁর মনের কোথাও বেদনাদায়ক একটি ক্ষতের মতন থেকে গেছে, কোনোক্রমে সেখানে আঘাত লাগলে যন্ত্রণা অনুভব করেন।··· রমলার আচমকা মনে হল, দেবীদাস যেন আজও তাই যৌবনকে ভয় পান, শরীরকে অস্বস্তির সঙ্গে দেখেন, তাঁর স্বভাবের কোথাও তাই আবেগ, বাসনা, প্রখর তাপ নেই। হয়তো তিনি রমলার অসামান্য যৌবনকেও এতকাল অস্বস্তির সঙ্গে দূরে সরিয়ে রেখেছেন এই ভীতি-বশত, নিজের প্রতি অবিশ্বাসবশত। হয়তো তিনি হৃদয়কে সম্ভবমতন সংযত ও শান্ত রাখতে চেয়েছেন। হয়তো তাঁর নিজের প্রতি ঘৃণা তাঁকে স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে বাধা দিয়েছে। দেবীদাস নিজের পাপভোগ যেন মনে মনে এতকাল অনুশোচনার মতন ভুগে এসেছেন।

গাছের পাতাগুলি এ-সময় শব্দ করে কাঁপছিল, নিকট এবং দূরের বৃক্ষগুলিতে প্রবল বাতাস লেগেছে, বৃষ্টি আসছে, বাতাস আর্দ্র ও ঠাণ্ডা, ঝিল্লি-স্বর কানে আসছিল, কয়েকটি পাখি এক গাছ থেকে অন্য গাছে চলে গেল নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের আশায়, বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ কানে আসছিল।

রমলা অবশ বেহুঁশ গলায় বলল, "তুমি কি এখনও সেই দুঃখ পাও ?"

"পাই।···আমার যখনই মনে পড়ে, মাথা নীচু হয়ে আসে ; ভাবি, কেন এই অনুচিত কাজ করেছিলাম !"

রমলা যেন নিজের জীবনের দিকে তাকাল। তার জীবনের অনুচিত কাজগুলির জন্যে রমলা কেন এমন করে অনুতপ্ত নয় ?

সামান্য পরে দেবীদাস বললেন, "সেদিন আমি একটা অদ্ভুত স্ব

দেখেছিলাম, তুমি যেদিন মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে উঠে চলে গিয়েছিলে। সত্যি সত্যিই আজকের এই আমি—বয়সে প্রবীণ হয়ে, চোখ মুখ গম্ভীর করে জীবনের এক সাজানো কাচের বাক্সে পুতুলের মতন সাধুপুরুষ হয়ে বসে আছি। কিন্তু আমার পরিচয় শুধু আজকের দেবীদাস নয়। মানুষের সমস্ত জীবন জুড়ে তার পরিচয় তৈরী হয়। যৌবন-বয়সের সেই অক্ষম দেবীদাস, সেও আমার জীবনের মধ্যে বইকি। সেই দেবীদাস একেবারে গালার মতন, যার একটু আগুন সহ্য হয় নি, সুমিত্রার পাশে যেতেই জ্বলে উঠেছিল···কি করে নিজের এই গলে-যাওয়া চেহারাটা ভুলব!”

বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল বৃষ্টি। জলের ছাট এসে লাগছিল। রমলা ভিজছিল, দেবীদাসও ভিজছিলেন।

বৃষ্টির শব্দের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে দেবীদাস বললেন মৃদু গলায়, “অনেক ভুগে, ভেবে আমি একটা সান্ত্বনা পেয়েছি নিজের কাছে। ওই গ্লানিটুকু যদি বেঁচে না থাকত আমি কি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম! হয়তো তোমার-আমার বিবেক বাঁচাতে এই গ্লানির বোধটুকু দরকার।”

জল এসে রমলাকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। কখন যেন উঠে দাঁড়িয়ে রমলা দেবীদাসের কাঁধের কাছে হাত রাখল, কোনো রকমে বলল, “ঘরে চলো, আমরা ভিজে যাচ্ছি।”

দেবীদাস আস্তে আস্তে উঠলেন। বললেন, “চলো।”